৪

এ ইউনিটের পাঠগুলোর মধ্যে যৌক্তিক যোগসূত্রটি নিম্নরূপ। প্রথমে বাংলাদেশে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত উৎপাদনের সংজ্ঞা এবং প্রকারভেদ বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় পাঠে এসব বিভিন্ন ধরনের শিল্প উৎপাদনের ঐতিহাসিক প্রবৃদ্ধি প্রবণতা বর্ণনা করা হয়েছে। সমগ্র শিল্প উৎপাদনের প্রবৃদ্ধিতে কোন উপশিল্পখাত কি রকম অবদান রেখেছে সেটিও এই পাঠে তুলে ধরা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হচ্ছেঃ

□পাঠ-১. শিল্পখাত ঃ সংজ্ঞা ও কাঠামো

□পাঠ-২. শিল্পখাত ঃ প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ও বিন্যাস

□পাঠ-৩. শিল্পখাত ঃ উৎপাদন সম্পর্ক

□পাঠ-৪. শিল্পখাত ঃ মুক্ত বাণিজ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন

□পাঠ-৫. শিল্পখাত ঃ শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ

পাঠ-৪.১. শিল্পখাত ঃ সংজ্ঞা ও কাঠামো

এই পাঠ শেষ আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশে 'শিল্পখাতের' গঠন কি ধরনের;
- এই গঠনের মধ্যে বৈপরীত্যগুলো কি;
- শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধরনের শিল্পের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্যসমূহ কি;
- শিল্প খাতের বিন্যাস ও আয়তন জানার জন্য যেসব পরিসংখ্যান ও তথ্যাবলী জানা দরকার সেগুলোর বাংলাদেশী উৎসসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা।

শিল্পখাত ঃ দুই বিপরীত মেরু

বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রধানত: দুই বিপরীত মেরুতে বিভক্ত করে দেখা হয়-

ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প। খ. কুটির শিল্প।

এই দুই বিপরীত ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরাজমান বৈপরীত্যগুলো সংক্ষেপে নিচে তুলে ধরা হল-

ক. সাধারনত: বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পগুলোর মালিকানা বাংলাদেশে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়। বিশেষত: বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে যৌথ মালিকানা (Corporate Ownership) বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার উপস্থিতি অপেক্ষাকৃত অধিক। পক্ষান্তরে কুটির শিল্পের মালিকরা হচ্ছেন ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র পরিবার। প্রায় কোন ক্ষেত্রেই এদের মালিকানা "অংশীদারী যৌথ" বা রাষ্ট্রীয় মালিকানার মতন হয় না।

খ. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানে আয়তনের কারণেই শুধু পারিবারিক শ্রম যথেষ্ট নয়। এখানে শ্রম বাহিনী মজুরি বা বেতনের বিনিময়ে শ্রম দান করে থাকেন। এই অর্থে এসব প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নিয়োগকারী হিসেবে প্রতিষ্টানের জন্য শ্রমিক নিয়োগ (Hire) করে থাকেন। পক্ষান্তরে কুটির শিল্পের মালিক পরিবারগুলো নিজেরাই পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে তাদের প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম নির্বাহ করেন। এই অর্থে কুটির শিল্পের মালিকরা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সম্পত্তির (Personal Property) মত তাদের শিল্পের সঙ্গে জড়িত থাকেন এবং এখানে মালিক খুব কম সময়েই কারখানা চালানোর জন্য শ্রম দান করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাড়া করা ব্যবস্থাপকের চালানো হয়।

গ. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন প্রধানত: ধনী ক্রেতার ক্রয় করে থাকেন। এসব শিল্পের উৎপাদনের বৃহৎ অংশ হয় শহরে অথবা বিদেশী বাজারে বিক্রি/রপ্তানি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে কুটির শিল্পের উৎপাদন গ্রামীন দরিদ্র জনগণের বাজারে বিক্রি হয়ে থাকে।

ঙ. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের একটি বড় অংশের বিনিয়োগ তহবিল সাধারণত: আধুনিক ব্যাংক ঋণ বা শেয়ার বাজার থেকে সংগৃহীত হয়। কিন্তু কুটির শিল্পের প্রাথমিক বিনিয়োগ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পারিবারিক সঞ্চয় থেকেই আসে। সম্প্রতি এন.জি.ও কর্তৃক ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্পের বিস্তারের ফলে কুটির শিল্পের জন্য কিছু বিকল্প পুঁজির/ঋণের উৎস সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষুদ্র শিল্প ঃ দুই বিপরীতের মধ্যবর্তী সত্তা

বাংলাদেশে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প (Large and Medium Industries) এবং কুটির শিল্প (Cottage Industry) এই দুই চরম বিপরীতধর্মী প্রতিষ্ঠানের মাঝখানে রয়েছে মিশ্র চরিত্রের অধিকারী "ক্ষুদ্র শিল্প"। ক্ষুদ্র শিল্পের মালিকানা একান্ত ব্যক্তিগতও নয় আবার পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিক নির্ভরও নয়। এখানে পারিবারিক শ্রমও আছে, আবার কিছু মজুরি শ্রমও রয়েছে, এখানকার প্রযুক্তি পুরোপুরি ব্যক্তিগত মালিক নির্ভরও নয়। এখানে পারিবারিক শ্রমও আছে, আবার কিছু মজুরি শ্রমও রয়েছে, এখানকার প্রযুক্তি পুরোপুরি দেশীয় নয়, আবার পুরোপুরি বিদেশীও নয়, এরা খুব বেশি পুঁজিঘনও নয় আবার অত্যাধিক শ্রম নির্ভরও নয়। এদের বাজার ধনী-দরিদ্র, দেশী-বিদেশী নির্বিশেষে প্রসারিত।

বাংলাদেশে যখন আমরা শিল্পখাতের কথা বলি তখন সামগ্রিকভাবে আমরা বৃহৎ মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক শিল্প খাতকেই বুঝে থাকি।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, ক্ষুদ্র শিল্প হচ্ছে আমাদের দেশের বৃহৎ ও কুটির শিল্প এই দুই বিপরীত মেরুর মাঝখানে বিদ্যমান মধ্যবর্তী ধরনের শিল্প।

বাংলাদেশে যখন আমরা শিল্পখাতের কথা বলি তখন সামগ্রিকভাবে আমরা বৃহৎ, মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত সামগ্রিক শিল্প খাতকেই বুঝে থাকি।

শিল্পখাত ঃ পরিসংখ্যানের উৎসসমূহ

সাধারণত: শিল্পখাত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তসমূহ পাওয়া যাবে সরকারী শিল্প জরিপ (Survey of Manufacturing Industries) এবং কুটির শিল্প জরিপে (Survey of cottage Industry) ।

এই দুইটি উৎস অর্থাৎ শুমারি (Census) এবং জরিপের (Survey) জন্য সরকারী সংস্থাগুলো শিল্পের যে প্রকারভেদ ও সংজ্ঞা ব্যবহার করেছেন তা আমাদের পুর্বোল্লেখিত সংজ্ঞার কাছাকাছি হলেও, সর্বদা হুবহু একরকম নয়।

সাধারণত: শিল্প-শুমারিতে (Census of Manufacturing Industries, CMI) যে সব শিল্প প্রতিষ্ঠানকে তথ্য সংগ্রহের জন্য নির্বাচনযোগ্য ধরা হয় তাদের মূল নির্বাচনী মাপকাঠি হচ্ছে- বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে ৩০০ জনের অধিক নিয়োজিত, মাঝারি শিল্পের জন্য ১২১-৩০০ জন শ্রমিক থাকবে। এসব প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের সম্পত্তি মূল্য বৃহৎ শিল্পের জন্য ৫০ কোটি টাকা বা এর অধিক একক মাঝারি শিল্পের জন্য ১৫-৫০ কোটি টাকা জমির এবং কারখানা ব্যতীত স্থায়ী সম্পদের মূল্য প্রতিস্থাপন ব্যয়সহ থাকবে। SMI জরিপে যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাদের গড় বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে-

CMI কর্তৃক নির্বাচিত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাধারণভাবে বৃহদায়তন বা মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করাই শ্রেয়।

১। এদের সম্পত্তি মূল্য ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৭৫ লক্ষ ১৫ কোটি টাকা।

২। এদের শ্রমিক সংখ্যা ৩১ থেকে ১২০ এর মধ্যে (যদি যান্ত্রিক ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়)

হস্তচালিত তাঁত জরিপ: ১৯৮০-৮২ থেকে শুধুমাত্র হস্তচালিত তাঁত সংক্রান্ত তথ্যমালা পাওয়া যায়। এই বিশেষ তথ্যগুলোকে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের কোন একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে পরিমাপ করা সম্ভব। তবে তা পরিমাপক বা গবেষকের নিজস্ব বিচার বিবেচনার উপরে নির্ভরশীল।

কুটির শিল্পের নমুনা জরিপ: ১৯৮০-৮২ সালে (Survey of Cottage Industries, SCI) এর অধীনে শুধুমাত্র সেসব প্রতিষ্ঠানকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেগুলো পুরোপুরিভাবে একান্ত ব্যক্তিগত

মালিকানা নির্ভর অর্থাৎ যেগুলো পুরোপুরি পারিবারিক শ্রম ব্যবহার করে চালানো হয়। অবশ্য হস্তচালিত তাঁত পারিবারিক শ্রমভিত্তিক হলেও, তাকে কুটির শিল্পের অন্তর্ভূক্ত ধরা হয়নি।

সামগ্রিক বিচারে আমরা লক্ষ্য করছি যে, বাংলাদেশে তিন রকম শিল্প সম্পর্কে পৃথক পৃথক ২টি উৎস থেকে তথ্য সংগৃহীত হতে পারে। শিল্প জরিপ বা Survey of Manufacturing Industries (SMT) থেকে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের বিষয়ে তথ্যাবলী পাওয়া যাবে। ক্ষুদ্র শিল্পের জরিপ বা Survey of Small Industries থেকে ক্ষুদ্র শিল্পের তথ্য এবং Survey of Cottage Industries থেকে কুটির শিল্প সম্পর্কে তথ্যাবলী পাওয়া যেতে পারে।

সারসংক্ষেপে

বাংলাদেশের শিল্পখাত তিন প্রকার শিল্পের সমন্বয়ে গঠিত। বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প ও কুটির শিল্প এই দুই ধরনের শিল্প বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। মালিকানা, শ্রমিক নিয়োগ, প্রযুক্তি, বাজার ও পুঁজির উৎস ইত্যাদি সবগুলো ক্ষেত্রেই এরা পরস্পর পৃথক। পক্ষান্তরে এই দুই বিপরীতের মাঝখানে রয়েছে মিশ্র চরিত্রের অধিকারী ক্ষুদ্র শিল্প।

বাংলাদেশ শিল্প সংক্রান্ত তথ্যাবলীর উৎস মূলত: ২টি। শিল্প-জরিপ থেকে পাওয়া যায় বৃহৎ, মাঝারি শিল্প সংক্রান্ত তথ্য; ক্ষুদ্র শিল্প সংক্রান্ত তথ্য এবং কুটির শিল্প সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায় কুটির শিল্প জরিপ থেকে। এসব শুমারি ও জরিপে যেসব সংজ্ঞা ব্যবহৃত হয়েছে তা সতর্কভাবে গবেষককে মূল্যায়ন সাপেক্ষে ব্যবহার করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১। বাংলাদেশের শিল্পখাতে রয়েছে-

ক. দুই ধরনের শিল্প; খ. তিন ধরনের শিল্প, গ. অসংখ্য বিভিন্ন ধরনের শিল্প।

২. বাংলাদেশের বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প-

ক. কুটির শিল্পের তুলনায় সম্পূর্ণ আলাদা ও বিপরীত;

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের তুলনায় আলাদা ও বিপরীত;

গ. কৃষির তুলনায় আলাদা ও বিপরীত।

৩. বাংলাদেশে ক্ষুদ্র শিল্পকে-

ক. মধ্যবর্তী শিল্প বলা যায়; খ. প্রান্তিক শিল্প বলা যায়; গ. অসংগঠিত শিল্প' বলা যায়।

৪. শিল্প শুমারিতে যেসব শিল্পকে নির্বাচন করা হয়েছে তাদের শ্রমিক সংখ্যা-

ক. ১০ জনের অধিক; খ. ২০ জনের অধিক; গ. ৫০ জনের অধিক।

৫. কুটির শিল্প জরিপে শুধুমাত্র সেসব শিল্পকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা-

ক. কুটির শিল্প' হিসেবে পরিচিত;

খ. শুধুমাত্র পারিবারিক শ্রম দ্বারা চালিত হয়;

গ. যাদের উৎপাদন কাজ কুটিরের ভেতরে সম্পন্ন হয়।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. কুটির শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি?

২. শিল্প সংক্রান্ত তথ্যের বাংলাদেশী উৎসগুলো কি? লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের শিল্পের প্রকারভেদ সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করুন।

২. আপনার গ্রামে/মহল্লায় যেসব শিল্প রয়েছে তাদের শ্রেনী বিন্যাস তৈরি করুন।

পাঠ-৪.২. শিল্পখাত ঃ প্রবৃদ্ধির প্রবণতা ও বিন্যাস

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীনতার আগে ও পরে আমাদের শিল্পখাতের কর্মনিয়োজন ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে বৃহৎ-মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আপেক্ষিক অবদানের মাত্রা কি ছিল;
- বৃহৎ-মাঝারি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উৎপাদন ও শ্রমনিয়োজন মাত্রা কি অনুপাতে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার পরিণতি হিসেবে এসব শিল্পের শ্রম-উৎপাদনশীলতায় কি পরিবর্তন হয়েছে;
- স্বাধীনতার পরবর্তীতে শিল্পখাতে অভ্যন্তরের কাঠামোগত পরিবর্তন।

শিল্প খাত : উৎপাদন ও শ্রমশক্তির বিন্যাস

যদি বাজারে অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার নিয়ম চালু থাকে তাহলে দীর্ঘমেয়াদে অধিক উৎপাদনশীল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পই শিল্পখাতের মোট উৎপাদনের এবং মোট কর্মনিয়োজনের সিংহভাগ দখল করে নেবে।

আমরা আগের পাঠে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত তিনটি উপখাতকে চিহ্নিত করেছি এবং তাদের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করেছি। কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে শিল্পখাতে মোট যে উৎপাদন হচ্ছে তা কোন উপখাত থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি বা কম আসছে। পোশাকী ভাষায় একে বলা হয় উপখাতওয়ারী শিল্প উৎপাদনের বিন্যাস। একইভাবে আমরা দেখতে পারি শিল্পখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তির বিন্যাসটিই বা কেমন আছে অর্থাৎ কোন উপখাতে বেশিরভাগ শ্রমিকরা নিয়োজিত? আমাদের আগের পাঠটি মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে আমরা সহজেই নিম্নোক্ত পূর্বানুমানসমূহ (Hypotheses) উপনীত হতে সক্ষম হব।

ক. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে তুলনামূলকভাবে অনেক কম শ্রমিক নিয়োজিত হবে কিন্তু তুলনামূলকভাবে তাদের উৎপাদন বা মূল্য সংযোজন মাত্রা (Value Added) বেশি হবে।

খ. বিপরীতক্রমে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি শ্রমিক নিয়োজিত হবে এবং তুলনামূলকভঅবে এসব শিল্পে মূল্য সংযোজন মাত্রা কম হবে।

গ. যদি বাজারে অর্থনীতির স্বাভাবিক প্রতিযোগিতার নিয়ম চালু থাকে তাহলে দীর্ঘমেয়াদে অধিক উৎপাদনশীল বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পই শিল্পখাতের মোট উৎপাদনের এবং মোট কর্মনিয়োজনের সিংহভাগ দখল করে নেবে। অবশ্য "ক্ষুদ্রই সুন্দর" এই মতের প্রবক্তারা বা আধুনিক কোন কোন অর্থনীতিবিদ এই অনুমানটি নাও সত্য হতে পারে বরে মনে করেন। এখানে এই অনুমানটি নিছক অনুমান হিসেবেই উত্থাপিত হয়েছে।

এসব পূর্বানুমানের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প, ক্ষুদ্র শিল্প ও কুটির শিল্পের মূল্য সংযোজন মাত্রা ও কর্মনিয়োজন মাত্রা সম্পর্কে কালানুক্রমিক নির্ভরযোগ্য তথ্য হাতের কাছে থাকা দরকার। কিন্তু এটি খুবই দুর্লভ। আমাদের সৌভাগ্য যে, অধ্যাপক এ আর খান ও মাহাবুব হোসেন লিখিত গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যমালা সংকলিত হয়েছে। পরবর্তী অনুচ্ছেদে যেসব তথ্যমালার ভিত্তিতে আমরা শিল্পখাতের উৎপাদন ও শ্রমশক্তির বিন্যাস সম্পর্কে একটি পরিমাণগত ধারণা নির্মানের চেষ্টা করবো। আমাদের বিশ্লেষণ ও পরিসংখ্যানগুলো পূর্বোক্ত পূর্বানুমানগুলো যাচাই করতে ও যথেষ্ট সহায়ক হবে।

শিল্পখাতের উৎপাদন ও কর্মনিয়োজনের পরিমাণগত সূচকসমূহ:

৪.১ নং সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে আমরা ১৯৬৭/৬৮ সালের শিল্পখাতের উৎপাদন ও কর্মনিয়োজন বিন্যাসের সঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৮১-৮২ সালের উৎপাদন ও কর্মনিয়োজন বিন্যাসের তুলনা করতে পারি। ঐ তুলনা থেকে শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপখাতের তুলনামূলক প্রবৃদ্ধির হার গতি-প্রবণতা সম্পর্কেও ধারণা করা সম্ভব। ১৯৬৭-৬৮ সালে বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের যথাক্রমে শ্রমিক সংখ্যা ছিল সমান এবং ৫৫৬ শতাংশ

বেশি। কিন্তু ঐ একই বছরে ক্ষুদ্র শিল্পে মূল্য সংযোজন মাত্রা ছিল বৃহৎ শিল্পের মূল্য সংযোজনের তুলনায় ৫৩ শতাংশ কম এবং কুটির শিল্পের মূল্য সংযোজন ছিল ৬৫ শতাংশ কম। স্বভাবত: ই দেখা যাচ্ছে যে, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা যদি ১০০ হয়, তাহলে ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা হবে তার প্রায় অর্ধেক (৪৭) এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সেটা হবে ২০ ভাগের এক ভাগ। স্বাধীনতা পরবর্তীতেও শতাংশ কম। পক্ষান্তরে কুটির শিল্প ঐ বছর প্রায় তিনগুণ বেশি শ্রমিক (বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সংযোজনের মাত্র পাঁচ ভাগের চার ভাগ। এই দুই বছরের তথ্য আমাদের প্রথম দুইটি পূর্বানুমানের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত করে।

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা যদি ১০০ হয়, তাহলে ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা হবে তার প্রায় অর্ধেক (৪৭) এবং কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে সেটা হবে ২০ ভাগের এক ভাগ।

সারণী ৪.১ ঃ শিল্প খাতের প্রবৃদ্ধির সূচকসমূহ ঃ ১৯৬৭/৬৮-১৯৮১/৮২

শিল্পের ধরণ	প্রাক-স্বাধীনতা আমল: ১৯৬৭-৬৮		
	মূল্যসংযোজন সূচক	কর্মনিয়োজন সূচক	শ্রমের উৎপাদনশীলতার সূচক
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০০	১০০	১০০
ক্ষুদ্র শিল্প	৪৭	১০০	৪৭
কুটির শিল্প (হস্তচালিত তাঁতসহ)	৩৫	৩৫৬	৫
	স্বাধীনতা পরবর্তী আমল: ১৯৮১-৮২		
	মূল্যসংযোজন সূচক	কর্মনিয়োজন সূচক	শ্রমের উৎপাদনশীলতার সূচক
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	১০০	১০০	১০০
ক্ষুদ্র শিল্প	৩৯	৮৮	৪৪
কুটির শিল্প (হস্তচালিত তাঁতসহ)	৮০	৩৮৭	২১

নোট:এখানে প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী উভয় বছরেই বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের উৎপাদন ও কর্মনিয়োজন মাত্রাকে ভিত্তি (Base) বা ১০০ হিসাবে ধরে বাকী হিসাবগুলো নির্ণয় করা হয়েছে।

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬

এছাড়া অপ্রত্যক্ষ যেসব সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হতে পারি তা হচ্ছে-

ক. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে যে হারে কর্মনিয়োজন বেড়েছে সে তুলনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মনিয়োজন বৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে কম। এজন্য এদের মধ্যে কর্মনিয়োজন অনুপাতটি ক্রমশ:হ্রাস পেয়েছে (এই হ্রাসটি নিজে নির্ণয় করুন)।

খ. ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে মূল্য সংযোজন বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্লথ গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মাঝারি ও বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের শ্রম-উৎপাদনশীলতার ব্যবধান (gap) আরো সামান্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

গ. কিন্তু কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে নাটকীয় উন্নতি লক্ষ্যনীয়। কুটির শিল্পের মূল্য সংযোজন বৃহৎ শিল্পের তুলনায় অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পেয়েছে। কর্মনিয়োজন মাত্রাও তুলনামূলকভাবে খুবই কম বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে কুটির শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতার ব্যবধান এখনো উঁচু হলেও (১ঃ৫) বর্তমানে তা আগের তুলনায় (১ঃ২০) অনেক কম।

এসব তথ্য থেকে আমরা আমাদের তৃতীয় পূর্বানুমানটিকে পুরোপুরি সমর্থন বা পুরোপুরি বিরোধীতা কোনটিই করতে পারছি না। একদিকে যেমন দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র শিল্পের পক্ষে উৎপাদনশীলতার ব্যবধান কমিয়ে আনা সম্ভব হচ্ছে না অর্থাৎ তাদের ক্রমশ: আরো অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, অন্যদিকে আবার অতি ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান হ্রাস পাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়

বাংলাদেশে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা অবশ্যই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তুলনায় বেশী। এর মূল কারণ এদের অপেক্ষাকৃত পুঁজি ঘণ প্রযুক্তি। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে ক্রমশ: এই উৎপাদনশীলতা ব্যবধান হ্রাস পচ্ছে।

যে, বাংলাদেশে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের শ্রম উৎপাদনশীলতা অবশ্যই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তুলনায় বেশী। এর মূল কারণ এদের অপেক্ষাকৃত পুঁজি ঘণ প্রযুক্তি। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে ক্রমশ: এই উৎপাদনশীলতা ব্যবধান হ্রাস পচ্ছে। ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হলেও তার অনেকখানি কারণ সম্ভবত: ক্ষুদ্র শিল্পকে ১৯৮১-৮২ সালে এমনভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল যে এর একটি বড় অংশ কুটির শিল্পের ভেতরে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

শিল্পখাত ঃ কাঠামোগত পরিবর্তন

শিল্পখাতের অভ্যন্তরীন কাঠামো প্রাক-স্বাধীনতাকালের তুলনায় স্বাধীনতা পরবর্তীতে বদলে গেছে। এই পরিবর্তনের গতি প্রবণতা ৪.২ নং সারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী ৪.২ : শিল্পখাত : কাঠামোগত পরিবর্তন (১৯৬৯/৭০-১৯৮৫/৮৬)

জি.ডি.পি-তে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের অবদান শতাংশ হিসাবে

বছর	জি.ডি.পি-তে বিভিন্ন প্রকার শিল্পের অবদান শতাংশ হিসাবে		
	বৃহৎ ও মাঝারি	ক্ষুদ্র ও কুটির	সমগ্র শিল্প
১৯৬৯-৭০	৬(৬৫)	৩.৩(৩৫)	৯.৩ (১০০)
১৯৭৪-৭৫	৫.৮(৫৫)	৪.৭(৪৫)	১০.৫(১০০)
১৯৭৬-৭৭	৫.৭(৫৫)	৪.৬(৪৩)	১০.৩(১০০)
১৯৮২-৮৩	৬.১(৫৮)	৪.৫(৪২)	১০.৬(১০০)
১৯৮১-৮২	৬.১(৫৭)	৪.৬(৪৩)	১০.৭(১০০)
১৯৮২-৮৩	৫.৬(৫৫)	৪.৫(৪৫)	১০.১(১০০)
১৯৮৩-৮৪	৫.৬(৫৫)	৪.৫(৪৫)	১০.১(১০০)
১৯৮৪-৮৫	৫.৬(৫৬)	৪.৪(৪৪)	১০.০(১০০)
১৯৮৫-৮৬	৫.৫(৫৬)	৪.৩(৪৪)	৯.৮(১০০)

উৎস: ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান. প্রাগুক্ত।

বাংলাদেশে ১৯৮৫-৮৬ সালে দেখা যাচ্ছে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের অবদান ৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান বেড়ে হয়েছে ৪৪ শতাংশ।

সারণীতে প্রদত্ত তথ্য থেকে দেখা যায় ১৯৬৯-৭০ জি.ডি.পি-তে শিল্পখাতের মোট অবদান ছিল মাত্র ৯.৩ শতাংশ। স্বাধীনতা পরবর্তীতে তা খুব সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮১-৮২ তে এই অবদান সর্বোচ্চ ১০.৭ শতাংশে পৌঁছায়। বাকি বছরগুলোতে অবদান মাত্র ১০ শতাংশের আশেপাশেই ক্রমাগত ঘুরপাক খেয়েছে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতার পর আমাদের শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি মোটেও আশাব্যঞ্জক হয়নি। সর্বদাই তা জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের সঙ্গে একই তালে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কোনমতে আপন আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০ শতাংশের মধ্যে ধরে রেখেছে। অবশ্য শিল্পখাতের অভ্যন্তরে উৎপাদন কাঠামোতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতার আগের সর্বশেষ বছরে মোট শিল্প উৎপাদনে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের অবদান ছিল ৬৫ শতাংশ এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান ছিল মাত্র ৩৫ শতাংশ। ১৯৮৫-৮৬ সালে দেখা যাচ্ছে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের অবদান ৫৬ শতাংশে নেমে এসেছে। পক্ষান্তরে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবদান বেড়ে হয়েছে ৪৪ শতাংশ। এই অভ্যন্তরীন কাঠামোগত পরিবর্তন পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত তথ্যমালার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও বটে।

১৯৭৭ সনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুকে প্রকাশিত সর্বশেষ তথ্যমালাও একই কথা বলেছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে চলতি বাজার মূল্যে জি.ডি.পি-তে শিল্পখাতের আপেক্ষিক অবদান মাত্রা হচ্ছে

মাত্র ৯.৬ শতাংশ। এবং এর মধ্যে ৬৬ শতাংশ উৎপাদন (অর্থাৎ জি.ডি.পি-র ৬.৩ শতাংশ) এসেছে বৃহৎ শিল্প থেকে এবং ৪৪ শতাংশ উৎপাদন এসেছে ক্ষুদ্র শিল্প থেকে। অবশ্য ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে কুটির শিল্পের অবদান যুক্ত হলে এই হিসাব আরো বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা যায়।

বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো (Enterprises) হচ্ছে- চিনি শিল্প, চা শিল্প, পাট শিল্প, চামড়া শিল্প, বস্ত্র শিল্প, গার্মেন্টস, শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, ঔষধ শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, মৌলিক ধাতু শিল্প এবং মেশিন ও যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প।

এসব শিল্পের মধ্যে কোন শিল্পের উৎপাদন কি হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একটি সাম্প্রতিক তথ্যতালিকা ৪.৩ নং সারণীতে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৪.৩ ঃ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সূচকের গতি-প্রবণতা (১৯৮৮-৮৯=১০০)

খাত	বৎসর		
	১৯৯২-৯৩	১৯৯৫-৯৬	বাৎসরিক প্রবৃদ্ধির হার
সমগ্র শিল্প খাত	১৪২	১৭৪	৭.৫০ শতাংশ
চিনি	১৭১	১৬৮	কোন প্রবৃদ্ধি হয়নি
চা	১১৯	১২৪	কোন প্রবৃদ্ধি হয়নি
বস্ত্র	১১২	৮৫	৮ শতাংশ নেতিবাচক (-)
পাট	৮৮	৭৯	প্রায় ৩.৩ শতাংশ নেতিবাচক (-)প্রবৃদ্ধি
গার্মেন্টস	২৬৯	৪৪০	২১.১৮ শতাংশ
চামড়া	১৪২	১৮০	৯ শতাংশ
কাগজ	১৮০	২৬০	১৫ শতাংশ
সার	১২৮	১৪১	৩.৩ শতাংশ
ঔষধ	২০৩	২৮৩	১৭ শতাংশ
সিমেন্ট	৬০	১২৪	৩৫.৩ শতাংশ
মৌলিক ধাতু	৬২	১৫৯	৬৮.৩ শতাংশ
যন্ত্রপাতি ও মেশিন	৯০	৯১	কোন প্রবৃদ্ধি হয়নি।

উৎস : বি.বি.এস ষ্ট্যাটিষ্টিকাল পকেট বুক, ১৯৯৭।

সমগ্র শিল্পখাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫০ শতাংশ বেড়েছে। ফলে জি.ডি.পি-তে শিল্পখাতের আপেক্ষিক অবদান বাড়ার কথা, কিন্তু লক্ষ্যণীয় হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুকের তথ্যানুযায়ী এই আপেক্ষিক অবদান এখনো ৯.৬ শতাংশে স্থির রয়েছে।

প্রদত্ত হিসাবানুসারে সমগ্র শিল্পখাতের উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার ৭.৫০ শতাংশ অর্থাৎ অতি সম্প্রতি হয়তো শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে সামান্য বেড়েছে। ফলে জি.ডি.পি-তে শিল্পখাতের আপেক্ষিক অবদান বাড়ার কথা, কিন্তু লক্ষ্যণীয় হচ্ছে স্ট্যাটিস্টিক্যাল পকেট বুকের তথ্যানুযায়ী এই আপেক্ষিক অবদান এখনো ৯.৬ শতাংশে স্থির রয়েছে। সুতরাং সমগ্র তথ্য নিয়েই বর্তমানে নানা বিতর্ক বিদ্যমান। তবুও মোটামুটিভাবে এ কথা বললে ভুল হবে না যে, আমাদের শিল্পখাতের মধ্যে তিন-চারটি প্রতিষ্ঠান ব্যতীত বাকী অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিস্থিতি হয় স্থবির না হয় নেতিবাচক। বড় জোর কোন প্রবৃদ্ধি হলেও তা জি.ডি.পি-র গড় প্রবৃদ্ধির হার (অর্থাৎ ৪-৫ শতাংশ) এর চেয়ে কম।

গ্রিক বিচারে গার্মেন্টস ঔষধ শিল্পকে আমরা বিদেশী বাজার নির্ভর ত্বদানকারী শিল্প এবং মেন্ট ও মৌলিক ধাতু শিল্পকে অভ্যন্তরীন বাজারে মূল নেতৃত্বদানকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

ব্যতিক্রমী শিল্প চারটি হচ্ছে, মৌলিক ধাতু শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, ঔষধ শিল্প এবং গার্মেন্টস শিল্প। প্রথম দুটি শিল্পের অগ্রগতির মূল কারণ সম্ভবত: আমাদের দেশের সাম্প্রতিক দালান-কোঠা নির্মাণের

দ্রুত প্রসার (Building Boom) এবং পরের দু'টি শিল্পের প্রসারের মূল চালিকাশক্তি শ্রমঘন সস্তা রপ্তানির প্রসার।

এছাড়া আরো দু'টি শিল্পে সম্মানজনক হারে প্রবৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর হয় এবং সে দু'টি হচ্ছে কাগজ ও চামড়া শিল্প। আমাদের অতীত গৌরব বস্ত্র ও পাট শিল্পকে বর্তমানে স্থবির বা নেতিবাচক প্রবৃদ্ধির মুখোমুখি হতে হয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্পকে আমরা বিদেশী বাজার নির্ভর নেতৃত্বদানকারী শিল্প এবং সিমেন্ট ও মৌলিক ধাতু শিল্পকে অভ্যন্তরীন বাজারে মূল নেতৃত্বদানকারী শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

শিল্পখাত ঃ তথ্য অসংগতিসমূহ

শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা প্রায়ই পরস্পর দ্বিমত পোষণ করেন। এর প্রধান কারণ কতিপয় তথ্য অসংগতি। তথ্যের উৎস ভেদে একই বিষয়ে নানারকম তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য্য ও ড. জায়েদ বখ্‌ত-এর হিসাবানুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮০/৮১ থেকে ১৯৮৪/৮৫ কালপর্বে জি.ডি.পি-তে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পসমূহের আপেক্ষিক গড় অবদান, বি.বি.এস সূত্রানুসারে ছিল ১০.৩০ শতাংশ এবং পরিকল্পনা কমিশনের তথ্যানুসারে ছিল ৯.০৮ শতাংশ (১৯৮৪-৮৫ সালের হিসাব)। আবার ১৯৮৫/৮৬ থেকে ১৯৮৯/৯০ কালপর্বেও তথ্যের ক্ষেত্রে এই একই হেরফের বজায় ছিল। যথাক্রমে তা ছিল ৮.৭৬ শতাংশ (বি.সি.এস), ৫.৯৩ শতাংশ (১৯৮৬-৮৭) এবং ৯.০১ শতাংশ (পরিকল্পনা কমিশন)।

কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের আপেক্ষিক অবস্থান ১৯৮৩-৮৪তে যে জায়গায় ছিল ৮.৮৮ শতাংশ, ১৯৮৫-৮৬ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯.৮৮ শতাংশ।

অথচ শ্রমশক্তি জরিপের (Labour Force Survey) তথ্যানুযায়ী ১৯৮০-র দশকে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা বেশ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কর্মে নিয়োজিত মোট শ্রমশক্তির ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের আপেক্ষিক অবস্থান ১৯৮৩-৮৪তে যে জায়গায় ছিল ৮.৮৮ শতাংশ, ১৯৮৫-৮৬ তে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৯.৮৮ শতাংশ। কিন্তু জি.ডি.পি-তে স্থবির আপেক্ষিক অবদান (১০ শতাংশের আশেপাশে) অথচ কর্মনিয়োজনে আপেক্ষিক অগ্রগতি,এই দুই ধরনের তথ্য পরস্পর কতটা সঙ্গতিপূর্ণ সে নিয়ে প্রশ্ন থেকে যেতে পারে। অবশ্য হয়তো এই সময় কর্মনিয়োজন আদৌ সেই অর্থে বৃদ্ধি পায়নি কারণ শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তাদের শ্রমশক্তি সরবরাহ নাও বৃদ্ধি পেতে পারে এবং তার ফলে উৎপাদন অগ্রগতি নাও ঘটতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় স্বাধীনতার পর আমাদের শিল্পখাতে তেমন কোন অগ্রগতি হয়নি। বিশেষত: জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার সবসময়ই ছিল কম অথবা বড়জোর সমান সমান। স্বাধীনতা পরবর্তীতে ক্ষুদ্র শিল্প না হলেও অন্তত: কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে কিছু অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়। ফলে সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতের অভ্যন্তরীন কাঠামো সামান্য পরিমানে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অনুকুলে পরিবর্তিত হয়। স্বাধীনতার পর সমগ্র শিল্পখাতে যে গুটিকয়েক শিল্প গতিশীল প্রবৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছে, বিশেষত: সম্প্রতি শিল্প উৎপাদনে নেতৃত্বদানকারী শিল্পগুলো হচ্ছে যথাক্রমে-সিমেন্ট, মৌলিক ধাতু শিল্প, গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্প। বস্তুত: শিল্পখাত নিয়ে আলোচনার অন্যতম অসুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্যমালার মধ্যে বিদ্যমান অসংগতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধির হার, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে-
   ক. জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের চেয়ে সর্বদাই অনেক বেশি ছিল;
   খ. গড়ে সর্বদাই কর্ম-বেশি জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের সমান ছিল;
   গ. সর্বদাই জি.ডি.পি-র প্রবৃদ্ধির হারের তুলনায় কম ছিল।

২. জি.ডি.পি-তে বর্তমানে শিল্পখাতের অবদান-
   ক. ১০ শতাংশের আশে-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে;
   খ. ১৫ শতাংশের আশে-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে;
   গ. ৫ শতাংশের আশে-পাশে ঘুরপাক খাচ্ছে।

৩. স্বাধীনতা পরবর্তীতে বিশেষত: সত্তর ও আশির মধ্যভাগ পর্যন্ত-
   ক. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃহৎ ও মাঝারী শিল্পের চেয়ে অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয়েছে ;
   খ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের তুলনায় শ্লত গতিতে প্রসারিত হয়েছে;
   গ. ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সঙ্গে সমান তালে প্রসারিত হয়েছে;।

৪. বাংলাদেশের শিল্প খাতের তথ্যমালা নিয়ে অসংগতির কারণ-
   ক. একই বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে বিভিন্ন রকম তথ্য পাওয়া যায় ;
   খ. বিভিন্ন বিষয়ে তথ্যের মধ্যে পরস্পর কোন সংগতি নেই;
   গ. ক এবং খ উভয়ই।

৫. বাংলাদেশের শিল্পখাতে বাইরের বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে-
   ক. গার্মেন্টস শিল্প খ. ঔষধ শিল্প; গ. গার্মেন্স ও ঔষধ শিল্প।

৬. বাংলাদেশের শিল্পখাতে বাইরের বাজারে নেতৃত্ব দিচ্ছে-
   ক. সিমেন্ট শিল্প; খ. সিমেন্ট ও মৌলিক ধাতু শিল্প; গ. মৌলিক ধাতু শিল্প।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধিতে কোন শিল্পগুলো বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছে ?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের তুলনামূলক অগ্রগতি সম্পর্কে অর্থনৈতিক পূর্বানুমানগুলো কি? বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে সেগুলোর সত্যতা যাচাই করুন।

২. আপনার নিজের এলাকায় যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে তাদের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন এবং অর্থনৈতিক পূর্বানুমানগুলো যাচাইয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ করে কি সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন তার বর্ণনা দিন।

পাঠ-৪.৩: শিল্পখাত : উৎপাদন সম্পর্ক

এই অধ্যায়ের আলোচনা থেকে আপনি জানতে পারবেন-

- স্বাধীনতার পর পর বাংলাদেশে কিভাবে সিংহভাগ শিল্প রাষ্ট্রয়ত্ব খাতের অধীনে ন্যস্ত হল;
- ৭৫ পরবর্তীতে কিভাবে ধীরে ধীরে শিল্প খাতে ব্যক্তি মালিকানার বিস্তার শুরু হল:
- ৮০-র দশকে সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় "ব্যক্তিগতকরণ" কিভাবে ত্বরান্বিত হল;
- "রাষ্ট্রয়ত্ব খাত" ও "ব্যক্তিখাত" নিয়ে যে অন্তহীন বিতর্ক চালু রযেছে তার সম্ভাব্য বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীগুলো কি;
- ব্যক্তিখাত ও রাষ্ট্রয়ত্ব খাতের কর্মকুশলতা প্রসঙ্গে বাংলাদেশে এ যাবৎ তুলনামূলক গবেষণা হয়েছে, তার সংক্ষিপ্ত ফলাফলের সংকলন;
- ব্যক্তিখ্যাত বনাম রাষ্ট্রীয় খাত এই বিতর্কের প্রতি একটি স্বচ্ছ প্রয়োগবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পক্ষে কিছু প্রাসঙ্গিক উপাত্ত ও সিদ্ধাসমূহ।

শিল্প খাতে মালিকানার বিবর্তন

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশ অঞ্চলে যে শিল্পায়ন হয় তার সিংহভাগ পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যক্তি মালিকদের মালিকানাধীন ছিল। অধ্যাপক রেহমান সোবহান ও মোজাফফর আহমেদ স্বাধীনতার ঠিক আগে আগে শিল্পখাতের স্থায়ী পরিসম্পদের যে মালিকানা বিন্যাস হিসাব করেছেন সেই অনুযায়ী ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের শিল্পখাতের মালিকানা বিন্যাস ছিল নিম্নরূপ-

ক. ৪৭ শতাংশ শিল্প = পাকিস্তানী ব্যক্তি মালিকদের অধীনে।

খ. ৩৪ শতাংশ শিল্প = ই.পি.আই.ডি.সি অর্থাৎ ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেপমেন্ট কর্পোরেশন তথা পাকিস্তানের সরকারী মালিকানাধীন।

গ. ১৮ শতাংশ শিল্প = বাঙালী মালিকানাধীন।

ঘ. ১ শতাংশ = বিদেশী মালিকানাধীন।

স্বভাবত: ই স্বাধীনতার পর প্রশ্ন ওঠে পাকিস্তানের (৪৭+৩৪) = ৮১ শতাংশ শিল্পের মালিক স্বাধীন বাংলাদেশে কারা হবেন? স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগ ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের অধীনে অনুষ্ঠিত শেষ জাতীয় নির্বাচনের ম্যানিফেষ্টো (১১ দফা দাবি দ্র:) প্রদান করেছিল; তাতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তারা ক্ষমতাসীন হলে পাট, বস্ত্র ও চিনি শিল্পগুলো জাতীয়করণ করবেন। তাছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম সরকার রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে 'সমাজতন্ত্রকে' গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এই রাজনৈতিক পটভূমিকায় শেষ পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ই.পি.আই.ডি.সি-র অধীনস্ত শিল্পসমূহ (১৮ শতাংশের মধ্যে ১৫ শতাংশ) সরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা হয়। এই হিসেবে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের মধ্যেই বাংলাদেশের শিল্পখাতের ৯৬ শতাংশ শিল্প সরকারী মালিকানায় চলে আসার কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত শিল্পগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্র ইউনিটগুলো জাতীয়করণের আওতা থেকে মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেগুলোর মাত্রা ছিল মাত্র ৪ শতাংশ। সুতরাং সব মিলিয়ে স্বাধীনতার ঊষালগ্নে বাংলাদেশের শিল্পখাতে ব্যক্তি মালিকানার আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় মাত্র ৮ শতাংশ। এই ৮ শতাংশের মধ্যে ১ শতাংশ ছিল বিদেশী ব্যক্তি মালিকদের দখলে, ৩ শতাংশ ছিল বাঙালী

মালিকদের অধীনে এবং ৪ শতাংশ ছিল পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র শিল্প। এছাড়া তদানীন্তন সরকার শিল্প সম্পত্তি মালিকানার উপর সিলিং আরোপ করেছিলেন। সিলিং আইন অনুসারে ব্যক্তিখাতের একজন শিল্পপতি সর্বোচ্চ ২৫ লক্ষ টাকার শিল্পের মালিক হতে পারতেন এবং ঐ শিল্পের লাভ জমিয়ে শিল্প সম্পদের মূল্য সর্বোচ্চ ৩৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধির অনুমতি দেয়া হয়েছিল। ঐ সময় আরও আইন করা হয় যে, বিদেশী বিনিয়োগ ব্যক্তিখাতে নিষিদ্ধ এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের যৌথ বিনিয়োগের অনুমতি তখনই দেয়া হবে যখন তারা সংখ্যালঘিষ্ট (Minor) অংশীদারিত্ব মেনে নিতে প্রস্তুত থাকবেন।

স্বাধীন বাংলাদেশে ই.পি.আই.ডি.সি-র অধীনস্ত শিল্পগুলো, পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত শিল্পসমূহ এবং বাঙালী মালিকদের পাট বস্ত্র ও চিনি শিল্পসমূহ সকরকারী মালিকানায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৭৫ সালে নির্মম হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সরকারের পরিবর্তনের পর ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ও ব্যক্তি মালিকানা অভিমুখীন নীতিমালা গৃহীত হতে থাকে। অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন যে, ১৯৭৪ সালেই মুজিব সরকার পুঁজিবাদী ব্লককে কিছু কিছু সুযোগ (Concessions) দিয়েছিলেন যেমন- "শিল্প পুঁজির সিলিং ৩ কোটি টাকার উন্নীত করা"। ব্যক্তিগত খাতে পুঁজি বিনিয়োগ সিলিং এরপর ১০ কোটিতে উন্নীত করা হয় এবং ১৯৭৮ সাল নাগাদ সকল সিলিং সম্পূর্ণ উঠিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭৫-১৯৭৮ এই তিন বছরে মোট ১১৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিগত খাতে হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯৭৬ সালে নতুন করে শেয়ার মালিকানা চালু করা হয়। ব্যক্তি খাতে বিদেশী পুঁজিপতিদের সঙ্গে বাঙালী মালিকদের যৌথ বিনিয়োগের বিরুদ্ধে সকল প্রতিবন্ধকতা তুলে দেয়া হয়। এইসব নতুন নীতিমালার কারণে ১৯৮১-৮২ সাল নাগাদ শিল্পখাতে মালিকানা বিন্যাসের চেহারাটি দাঁড়ায় নিম্নরূপ-

ক. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ঃ ৬৯.১০ শতাংশ
খ. দেশী-বিদেশী যৌথ ব্যক্তি মালিকানা ঃ ২.৫০ শতাংশ
গ. দেশী ব্যক্তি মালিকানাধীন ঃ ২৮.৪০ শতাংশ।

স্বাধীনতার উষালগ্নে বাংলাদেশের শিল্পখাতে ব্যক্তি মালিকানার আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় মাত্র ৮ শতাংশ। এই ৮ শতাংশের মধ্যে ১ শতাংশ ছিল বিদেশী ব্যক্তি মালিকদের দখলে, ৩ শতাংশ ছিল বাঙালী মালিকদের অধীনে এবং ৪ শতাংশ ছিল পাকিস্তানী মালিকদের পরিত্যক্ত ক্ষুদ্র শিল্প।

৮০-৯০ এর দশকে ব্যক্তিগতকরণ অভিযান

১৯৮২ সালে শান্তিপূর্ণ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করে। দীর্ঘ ৮ বছর তিনি একটানা সামরিক আধা-সামরিক শাসন চালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ক্ষমতা দখলের পরপরই ১৯৮২ সালে ঘোষিত হয় N.I.P (New Industrial Policy) এই নীতির অধীনে সর্বপ্রথম সরকারীভাবে বৃহৎ পাটকল ও বস্ত্রকলগুলো বিরাষ্ট্রিকরণের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হয়। মোটামুটি পানির দরে এগুলো প্রাক্তন মালিকদের কাছে হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গৃহীথ হয়। ১৯৮২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে পাট কলের সংখ্যা ছিল ৭২টি। মাত্র তিন বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৮৫ সাল নাগাদ এই সংখ্যা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬৮টি। মোট ৩৪টি পাটকল যাদের উৎপাদন ক্ষমতা হচ্ছে পাট উপখাতের মোট উৎপাদন ক্ষমতার ৩৮ শতাংশ, ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরিত হয়। একইভাবে ১৯৮২ সালে যেখানে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে বস্ত্রকলের সংখ্যা ছিল ৫২টি, সেখানে তিন বছরের মধ্যে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৩০টি। সুতরাং যদিও তদানীন্তন সরকার ৭৫ পরবর্তী ব্যক্তিগতকরণ নীতিই (Privatisation Policy) অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু তার আমলে এই নীতির ভরবেগ (Momentum) ছিল সবচেয়ে বেশি। ১৯৮৫ সাল নাগাদ রাষ্ট্রায়তন বৃহৎ শিল্পের সংখ্যা মাত্র ১৬০ টিতে নেমে আসে। যদিও ১৯৭২ সালে সেই সংখ্যাটি ছিল ৩৯২টি। ১৯৭২ সালে যে জায়গায়

১৯৭২ সালে শিল্পখাতের ৯২ শতাংশ সম্পদ ছিল রাষ্ট্রের মালিকানাধীন, ১৯৮৫তে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ।

শিল্পখাতের ৯২ শতাংশ সম্পদ ছিল রাষ্ট্রের মালিকানাধীন, ১৯৮৫তে তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত সময়েই বেশিরভাগ কলকারখানা ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত হয়েছিল। ১৯৯০ পরবর্তী কালে পুনরায় ব্যক্তিগতকরণের গতি শ্লথ হয়ে যায়। ১৯৯৩ সালে সরকার "Privatisation Board" গঠন করে মোট ৪৪টি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরের জন্য উক্ত বোর্ডকে দায়িত্ব দেন। কিন্তু বাস্তবে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ১২টি শিল্প ব্যক্তিমালিকানার পরিমাণ ছিল (Outstanding loan at the time of transfer) ৭৩ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। ১৯৯৮ সালের প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাবানুসারে "Privatisation Board" মোট ১৭টি শিল্প ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর সক্ষম হয়।

ব্যক্তিখাত ও রাষ্ট্রায়ত্ব খাত ঃ কর্মকুশলতার তুলনা

যতদিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষত: সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর বিকাশ মোটামুটি অব্যাহত ছিল ততদিন পৃথিবীর এ্যাকাডেমিক মহলে সাধারণভাবে গড় প্রচলিত মতটি ছিল নিম্নরূপ-

সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানাধীন শিল্পগুলোতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব এবং সামাজিক মালিকানায় এই প্রবৃদ্ধি হলে অর্থনৈতিক সমতাও অক্ষুন্ন থাকবে। বিপরীত পন্থীরা বলতেন, বাজারের প্রকৃত দাম এবং অর্থনৈতিক লাভ-লোকসানের বিচারে এটি অদক্ষ হতে বাধ্য। তাছাড়া সমাজতান্ত্রিক প্রবৃদ্ধি ও সমতার জন্য গণতন্ত্রকে ছাড় দিতে হয় যা কাম্য নয়। সাধারণভাবে প্রয়োগবাদীরা বলতেন, অর্থনৈতিক মুক্তি পেতে হলে রাজনৈতিক মুক্তি ছাড়তে হবে এবং রাজনৈতিক মুক্তি পেতে হলে অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়তে হবে। এ ধরনের সামাজিক "ছাড়ের" বিকল্প নেই।

কিন্তু ১৯৮২ সালে সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোর সরকার পতন ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের ফলে উপরোক্ত মতটি প্রাথমিকভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। তার জায়গায় যে মতটি প্রতিষ্ঠিত হয় তা হচ্ছে নিম্নরূপ-

ব্যক্তিগতমালিকানা ও বাজারে অর্থনীতি ছাড়া স্থায়ী অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ব্যক্তিমালিকানা ও বাজার অর্থনীতির ব্যর্থতাগুলোর প্রতিষেধক 'সমাজতন্ত্র' নয়, এই প্রতিষেধক হচ্ছে বাজার ও ব্যক্তি মালিকানার উপর গণতান্ত্রিক সরকারের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ।

চীনের অর্থনীতির অবিশ্বাস্য সাফল্যের কারণে নতুন একটি তৃতীয় মত ক্রমশ অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই মতানুসারে-

অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য দরকার প্রতিযোগিতা ও অধিকতর দক্ষতার জন্য পুরস্কার এবং কম দক্ষের জন্য তিরস্কার। এটি বাজার ও ব্যক্তি মালিকানায় যেমন সর্বদা সঠিকভাবে কার্যকর করা যায় না, তেমনি রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানা হলেই যে এটি অকার্যকর হয়ে যাবে তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সুতরাং ব্যক্তিমালিকানাধীন কারখানা যেমন দক্ষ হতে পারে, সময় বিশেষে উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক নকশার (Institutional Design) মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানাও দক্ষ হতে পারে। সুতরাং ব্যক্তিমালাকানা ও রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানা উভয়ের দক্ষতা নির্ভর করবে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতে (Content)

এবং 'অর্থনৈতিক খেলার নিয়মের' (Rules of the Economic game) উপর। এটি কোন পূর্ব নির্ধারিত তত্ত্বের অধীনস্ত নয়। প্রায়োগিক অভিজ্ঞতার দ্বারাই এটি নির্ধারণ করা উচিত।

১৯৯৮ সালের প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাবানুসারে মোট ১৭টি শিল্প ব্যক্তিখাতে হস্তান্তর সক্ষম হয়।

বাংলাদেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা সর্বশেষ মতটির পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। যেমন ব্যক্তিমালিকানাধর্মী রপ্তানিমুখী গার্মেন্টস শিল্প বাংলাদেশে সাফল্যের পরিচয় দিয়েছে। পক্ষান্তে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত পাট ও বস্ত্রকলগুলো গড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আগের মত লোকসানী শিল্প হিসেবেই টিকে রয়েছে। আবার বি.আর.টি.সি'র বাসগুলো সরকারী মালিকানায় রেখে, তাদের ব্যবস্থাপনা লীজ দেয়ার পর সেগুলো পুনরায় লাভজনক হয়ে উঠেছে। এ থেকে বোঝা যায় মালিকানার পরিবর্তন হলেই যে একটি শিল্প দক্ষ হয়ে উঠবে এরকম ভাবা অর্থনীতির দৃষ্টিতে নিছক বোকামীর পরিচায়ক হবে।

ব্যক্তিখাত বনাম রাষ্ট্রায়ত্ব খাত ঃ কর্মকুশলতার তুলনামূলক তথ্যাবলী

ব্যক্তিখাত ও রাষ্ট্রীয় খাতের কর্মকুশলতা বাংলাদেশে সামষ্টিক পর্যায়ে এবং ব্যষ্টিক পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রেই তুলনা করার প্রচেষ্টা গৃহিত হয়েছে। এসব গবেষণা প্রচেষ্টার পদ্ধতি (Methodology) নিয়ে নানা বিতর্ক এখনো অব্যাহত রয়েছে। এর প্রধান কারণ এই বিতর্কটিকে "আদর্শিক" (Ideological) বিতর্কে পরিণত করার ভ্রান্তি। যাই হোক এরপরেও গবেষণালব্ধ তথ্যাবলীর নিজস্ব মূল্য আছে বলে এখানে সংক্ষেপে এক জায়গায় এগুলো তুলে ধরা হল। বলাবাহুল্য এগুলোর ভিত্তিতে ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত টানার দায়িত্বটি এখানে নেয়া হয়নি।

সামষ্টিক পর্যায়ে ১৯৯১ সালে প্রকাশিত ড. সুলতান হাফিজের গবেষণা পত্রে [Two decades of trade and industrialisation in Bangladesh", O.E.C.D. Paris] দেখানো হয়েছে ১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ N.I.P পূর্ববতীকালে যখন শিল্পখাতে রাষ্ট্রায়ত্ব মালিকানার প্রাধান্য বজায় ছিল, তখন ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল প্রায় ৪.৯ শতাংশ। কিন্তু ব্যক্তিগতকরণ ত্বরান্বিত হওয়ার কালপর্বে অর্থাৎ ১৯৮২/৮৩-১৯৮৮/৮৯ পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩ শতাংশ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে "ব্যক্তিগতকরণের" গতি ত্বরান্বিত করার পরেও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয় নাই।

১৯৭৪-৭৫ থেকে ১৯৮২-৮৩ সাল পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল প্রায় ৪.৯ শতাংশ। কিন্তু ব্যক্তিগতকরণ ত্বরান্বিত হওয়ার কালপর্বে অর্থাৎ ১৯৮২/৮৩-১৯৮৮/৮৯ পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে গড় প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৩.৩ শতাংশ।

ব্যষ্টিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়খাতের তুলনা করেছেন একাধিক গবেষক। তাদের প্রাপ্ত ফলাফলগুলো নিম্নরূপ-

ক. সৈয়দ আখতার মাহমুদ, আহমেদ আহসান ও অধ্যাপক রেহমান সোবহান বিরাষ্ট্রীকৃত পাট ও বস্ত্রকলগুলোর কর্মকুশলতা রাষ্ট্রায়ত্ব অনুরূপ তুলনীয় পাট ও বস্ত্রকলগুলো সঙ্গে তুলনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, "এদের কর্মকুশলতার মধ্যে কোন নিশ্চিত তারতম্য নেই, অবশ্য তাদের এই তুলনার কালপর্ব ছিল বিরাষ্ট্রীকরণের পর পর প্রথম তিন বছরের কর্মকুশলতা।"

খ. বিনায়ক সেন বস্ত্রকলগুলোর কর্মকুশলতার তুলনা করে পেয়েছেন যে ১৯৮৫-১৯৯১ এই ৭ বছরের ব্যক্তিখাতের বস্ত্রকলগুলোর ৭৪ শতাংশ কমপক্ষে ৫ বছরই লোকসান দিয়েছে এরকম সরকারী বস্ত্রকলের সংখ্যা ছিল মোট সংখ্যার ৬২ শতাংশ।

গ. ১৯৮৩ সালে বিরাষ্ট্রীকৃত ৪৯৮টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর বিনিয়োগ বোর্ড এক জরিপ চালিয়ে যেটা দেখতে পায় তা হচ্ছে মাত্র ২১৪টি এখনো চলছে। যে ১৭৪টি চলছিল না তাদের মধ্যে ১৩৩টি ছিল বন্ধ আর ১৪১ টির কোন খোঁজই পাওয়া যায়নি।

ঘ. ১৯৮৬ বিশ্বব্যাংক-এর পক্ষ থেকে ব্যক্তিখাত-রাষ্ট্রায়ত্ব খাত নির্বিশেষে বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পখাতের উপর একটি বৃহৎ পর্যালোচনামূলক গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। গবেষনা পরিচালক ড: সাহোতার প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা মালিকনার উপর নির্ভর করে না, এটি প্রধানত: নির্ভর করে ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর (Managerial Efficiency) ।

সামগ্রিকভাবে শিল্পখাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা মালিকনার উপর নির্ভর করে না, এটি প্রধানত: নির্ভর করে ব্যবস্থাপকের দক্ষতার উপর।

ঙ. ১৯৯১-১৯৯৬ সালে যে ১৩টি শিল্প ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত হয়েছিল তাদের আগে পরে কর্মকুশলতার হেরফর নিয়ে বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়।

তাদের পর্যালোচনালব্ধ ফলাফল নিচে তুলে ধরা হল

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম	বিরাষ্ট্রী করণের আগে	বিরাষ্ট্রী করণের পরে
১. চিটাগাং সিমেন্ট ক্লিংকার এবং গ্রিডিং কোং	পুঁজি ব্যবহার মাত্র: ৫২% বিক্রয়মূল্য : ৪৯.৬৮ কোটি টাকা মোট শ্রমিক সংখ্যা : ৩১৬ লাভজনক	পুঁজি ব্যবহার মাত্রা: ৭২ শতাংশ বিক্রয় মূল্য: ৮৬.৪৫ কোটি টাকা মোট শ্রমিক সংখ্যা : ২৫২ লাভজনক
২. কোহিনুর কেমিক্যাল	সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ = ৬ কোটি টাকা বিরাষ্ট্রীকরণের ঠিক আগে আগে অলাভজনক ছিল।	বর্তমান লাভজনক। লাভের পরিমাণ = ৭৯ লাখ টাকা
৩. ৫ আর লিমিটেড	অলাভজনক লোকসান = ৫.৬৪ কোটি টাকা	অলাভজনক লোকসান ৪৭ লাখ টাকা
৪. কিশোরগঞ্জ টেক্সটাইল মিল	অলাভজনক লোকসান = ৬৪ লাখ টাকা	অলাভজনক লোকসান = ২.১৬
৫. ঈগলবক্স এবং কার্টন	অলাভজনক লোকসান = ১.৮৫ কোটি টাকা	অলাভজনক লোকসান = ৩.১৩ কোটি টাকা
৬. স্টাইল ফেবিক্স	অলাভজনক লোকসান = ১৩ কোটি টাকা	অলাভজনক লোকসান = ৩০ লাখ টাকা
৭. হামিদিয়া টেক্সটাইল মিল	অস্তিত্ব ছিল	এখন অস্তিত্ব নেই। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।
৮. ১৩ ঢাকা ভেজিটেবল অয়েল বি.ডি. সাইকেল ইন্ডাষ্ট্রি মাদারীপুর টেক্সটাইল এবং কোয়ান্টাম ফার্মাসিউটিক্যাল	চালু ছিল	এখন বন্ধ। কিন্তু চালু হওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

উৎস: সি.এ.এফ দৌলাহ্ ১৯৯৭ (বিশ্বব্যাংক)।

বস্তুত: শিল্পখাতের "লাভ-লোকসান" নিয়ে বিতর্ক অর্থহীন। কারণ সরকারী খাত ও বেসরকারী খাত উভয় খাতের শিল্পেরই রয়েছে কোটি কোটি টাকার অপরিশোধিত ঋণ। নীট মূল্য হিসাব করলে সরকারী-বেসরকারী নির্বিশেষে অনেক শিল্পই বর্তমানে নেতিবাচক মূল্যে পরিণত হতে পারে। ১৯৯২ সালে ঢাকা চেম্বারের প্রধান শিল্পপতি মাহাবুবুর রহমানের বক্তব্যে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দৈনিক সংবাদকে প্রদত্ত এক সাক্ষাৎকারে (২৭-১১-১৯৯২ তারিখের পত্রিকা দ্র:)। তিনি বলেন,"আমাদের দেশের ১২টি সরকারী সেক্টর কর্পোরেশন ১৯৯০-৯১ সালে ১১০০ কোটি টাকা নীট ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। অন্যদিকে ঐ একই বছরে ব্যক্তিখাতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল ১২০০ কোটি টাকা।"

সাধারণভাবে বলা যায় যে, যতদিন সরকারী খাত থেকে শিল্প ঋণ নিয়ে ফেরৎ না দিয়ে, শিল্প না তৈরি করে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে, ততদিন ব্যক্তিখাতে কোন দক্ষ শিল্প গড়ে উঠবে না। অনুরূপভাবে যতদিন সরকারী খাতে দিনের পর দিন লোকসান অব্যাহত রেখেও সরকারী ঋণ নিয়ে টিকে থাকা সম্ভব হবে, ততদিন সরকারী খাতও বাংলাদেশে দক্ষ হতে পারবে না। সরকারী-বেসরকারী খাতে তামাদী ঋণের এই মড়ক চিত্রটি যে কত মারাত্মক তা নিম্নোক্ত তালিকায় সুষ্টুভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৪.৪ (ক) ঃ ১০০ কোটি টাকার উর্ধ্বে তামাদী ঋণের বিন্যাস
(৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সনের হিসাব] কোটি টাকায়

খাত	তামাদী ঋণগ্রহিতার সংখ্যা	মোট গৃহীত ঋণ	মোট তামাদী ঋণ
ব্যক্তিগত	১৩৭	৩৭৫৭	২৮৬৯
রাষ্ট্রায়ত্ত্ব খাত	২৭	২৮৭৭	১৯৭৮
সর্বমোট	১৬৪	৬৬৩৪	৪৮৪৭

সারণী ৪.৪ (খ) ঃ ১০ কোটি টাকার উর্ধ্বে তামাদী ঋণের বিন্যাস
(৩০ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সনের হিসাব] কোটি টাকায়)

মোট গৃহীত ঋণ (কোটি টাকায়)			মোট গৃহীত ঋণের মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণের হার (শতাংশ)	
ব্যাংকের নাম	রাষ্ট্রায়ত্ব খাত	ব্যক্তি খাত	রাষ্ট্রায়ত্ব খাত	ব্যক্তি খাত
সোনালী	৯৯৭.১২	৮১৩৬.৫১	২৮.৬৭	৪০.৯১
জনতা	১০২৩.৫৩	৪৬১৪.৭৫	২১.৫৮	৩০.৩৫
অগ্রণী	৯৫৫.৪৮	৫০১৪.৪৭	৩৮.৭৪	৪১.১৪
রূপালী	৪৫২.৬৮	২১৫৫.৮৩	২৪.২৬	৩৮.৯৬
মোট	৪৪২৮.৮১	১৯৯২১.৫৬	২৮.৭৫	৩৮.৩১
পূবালী	২৫০.৪৯	১৩৭৮.৩৮	৯০৯৭	৩৭.৩০
উত্তরা	১৬৬.৪৫	১২০৭.১৪	৩৯.৬৬	৩২.১৪
মোট	৪১৬.৯৪	২৫৮৫.৫২	৭০.৪৯	৩৮.৮৯
সর্বমোট	৪৮৪৫.৭৫	২২৫০৭.০৮	৩২.৩৪	৩৭.৯২

উৎস: দৈনিক সংবাদ, ১২ মার্চ, ১৯৯৮

সারসংক্ষেপ

পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার উপর ভিত্তি করে পশ্চিম পাকিস্তানী শিল্পপতিদের মালিকানায় এদেশে শিল্পায়নের সূচনা হয়। স্বাধীনতার ঠিক আগে আগে ৮১ শতাংশ শিল্পের মালিক ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ই.পি.আই.ডি.সি এবং পশ্চিম পাকিস্তানী মালিকবৃন্দ। স্বাধীনতার পর "সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" গড়ে তোলার ধারায় উপরোক্ত ৮১ শতাংশের সঙ্গে আরো ১১ শতাংশ যোগ করে মোট ৯২ শতাংশ শিল্পের মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু এই মালিকানা ব্যবস্থা দক্ষতার সঙ্গে শিল্পায়ন ঘটাতে ব্যর্থ হয়। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের লুটপাঠের ভিত্তিতে গড়ে উঠে এক নব্য ধনীক শ্রেণী। ১৯৭৫ সালের পর থেকে শিল্পখাতে ক্রমাগত বিরাষ্ট্রীকরণের নীতি অনুসৃত হয়ে আসেছে। তবে ১৯৭৫-৯৮ কালপর্বে শিল্পখাতের ব্যক্তিগতকরণের নীতি সর্বোচ্চ ভরবেগ পেয়েছিল বিশেষত: ১৯৮২-৯০ কালপর্বে। কিন্তু বাস্তবে শুধু মালিকানা হস্তান্তরের মাধ্যমে শিল্পয়ত্ব খাত বিদ্যমান তার শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন অলাভজনক শিল্পে পরিণত হয়েছে, তেমনি গুটি কয়েক বিশেষ শিল্প ছাড়া ব্যক্তিখাতের শিল্পসমূহও বিশাল অংকের ঋণ খেলাপীতে পরিণত হয়েছে। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় বাংলাদেশের শিল্পখাতের প্রধান সমস্যা "মালিকানা" উপাদানের উপর, নির্ভরশীল নয়। বরং উপযুক্ত দক্ষ ব্যবস্থাপনা, কঠোর ঋণ শৃঙ্খলা, প্রতিযোগিতা ও সুষ্ঠু অর্থনৈতিক নীতিমালার দ্বারা কর্মকুশলতার অগ্রগতি সাধন সম্ভব। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক বিধি-বিধান ও আইনের প্রয়োগকারী কার্যকরী সংগঠন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. ১৯৬৯-৭০ সালে বাংলাদেশের শিল্পখাতের সিংহভাগ ছিল-
   ক. ই.পি.আই.ডি.সি-র মালিকানাধীন;
   খ. পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতিদের মালিকানাধীন;
   গ. ই.পি.আই.ডি.সি ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পপতি উভয়ের সম্মিলিত মালিকানাধীন;
   ঘ. বিদেশীদের মালিকানাধীন।

২. ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রায়ত্ব করার পর রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্প সম্পদের পরিমাণ ছিল-
   ক. ৮১ শতাংশ; খ. ৯০ শতাংশ; গ. ৯২ শতাংশ।

৩. ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৮ সালে মোট কয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরিত করা হয়েছিল-
   ক. ১১৬টি; খ. ১২০টি; গ. ১২৫টি।

৪. ১৯৮২-৯০ এই কালপর্বে "ব্যক্তিগতকরণ" অভিযান
   ক. শ্লথতর হয়; খ. তীব্রতর হয়; গ. একই গতিতে অগ্রসর হয়।

৫. বিভিন্ন শিল্পের তুলনামূলক দক্ষতা প্রধানত: নির্ভর করে-
   ক. মালিকানার চরিত্রের উপর; খ. বাজার ও প্রতিযোগিতার উপর;
   গ. অর্থনৈতিক প্রণোদনা কাঠামোর উপর; ঘ. "২" ও "৩" নং উভয় উপাদানের উপর।

৬. বর্তমানে কি ব্যক্তিগত কি রাষ্ট্রায়ত্ব খাত উভয় খাতের জ্বলন্ত সমস্যা হচ্ছে-
   ক. অতিরিক্ত শ্রমিক সংখ্যা; খ. অত্যাধিক শ্রেণীবিন্যাসকৃত ঋণ;
   গ. অব্যাহত লোকসান।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বিরাষ্ট্রীয়করণের ভরবেগ কখণ থেকে তীব্রতর হল?

২. "ব্যক্তিগত খাত বনাম রাষ্ট্রীয়খাত" এই বিতর্কে আপনার মতটি কি? (বাংলাদেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে লিখতে হবে)

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. ১৯৭৫ থেকে ১৯৯৮ পর্যন্ত ব্যক্তিখাতকে যেসম প্রধান প্রধান নীতিগত প্রণোদনা (Policy Incentive) দেয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা প্রণয়ন করুন।

২. বিভিন্ন কালপর্বে "বিরাষ্ট্রীয়করণের" মাত্রা কিরকম ছিল তা বোঝানোর জন্য একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।

পাঠ ৪.৪ ঃ মুক্ত বাণিজ্য ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়ন

এই পাঠ থেকে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশে মুজিব আমলে এবং আশি ও নব্বই দশকে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা কিরকম ছিল;
- এই নীতিমালা বৈদেশিক বাণিজ্যকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে এবং শিল্পায়নের দ্রুত অগ্রগতির পথে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে;
- উক্ত কালপর্বে বাংলাদেশে শিল্পবিমুখ নব্য ধনীক শ্রেণীর উদ্ভব ও তাদের চরিত্র;
- বৈদেশিক দাতাদে সুপারিশ অনুযায়ী অবাধ আমদানি ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের নীতি, তার ফলাফল, সবলতা-দুর্বলতা;
- ব্যক্তিখাতে সফল শিল্পায়নের অন্যতম দৃষ্টান্ত "তৈরি পোষাক" শিল্পের জন্ম, বিকাশ, সবলতা ও দুর্বলতা বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত "কেস স্টাডি"।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনার ইতিহাস

সাধারণভাবে স্বাধীনতার আগে এই অঞ্চলে বৈদেশিক মুদ্রার ব্যবস্থাপনা এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে আমদানি নিরুৎসাহিত হয় এবং সংরক্ষিত বাজারে দেশীয় শিল্পের প্রসার ঘটে। এই লক্ষ্যে কৃত্রিমভাবে টাকার তুলনায় বিদেশী মুদ্রার দাম সর্বদাই উঁচুতে রাখার চেষ্টা করা হয়। এছাড়াও অন্যান্য নানা পন্থায় বিদেশী পণ্যের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করে এদের দাম উঁচুতে রাখা হয়। এর ফলে পাকিস্তান আমলে যে বিশেষ ধরণের শিল্পায়ন সংগঠিত হয় তার কতগুলো সুস্পষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

ক. সংরক্ষিত বাজারে অপেক্ষাকৃত অদক্ষ শিল্প গড়ে উঠে।

খ. আমদানির কমতির কারণে বাজারে আমদানিকৃত পণ্যের ঘাটতি বজায় থাকে এবং দাম বেড়ে যায়, ফলে আমদানিকারকরা বেশ উচ্চ হারে লাভ আদায় করতে সক্ষম হয়।

গ. যেহেতু কৃত্রিমভাবে টাকার দাম উঁচুতে রাখা হয় সেহেতু রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ব্যাহত হয়।

ঘ. বস্তুত বাংলাদেশের তদানীন্তন প্রধান রপ্তানি দ্রব্য পাট উৎপাদনকারী চাষীরা তাদের পাটের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদেরকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার কার্যকর মূল্য ফেরৎ দেয়া হয়নি। অথচ পাট শিল্পকে সরকার যে রপ্তানি বোনাস ও ভর্তুকি দান করেন তার পুরো টাকাটাই বৈদেশিক পাট শিল্প মালিকদের যেমন, আদমজী, বাওয়ানী ইত্যাদি) হাতে জমা হয়।

ঙ. পশ্চিম পাকিস্তানের পুঁজিপতিরা প্রথমে আমদানি ব্যবসা করে এবং পরে সংরক্ষিত বাজারে আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পায়নের মাধ্যমে খুব দ্রুতই ফুলে ফেঁপে উঠেন এবং তাদের মধ্যে একচেটিয়া ২২টি পুঁজিপতি পরিবারের উদ্ভব হয়।

চ. আয় ও সম্পদের এই কেন্দ্রীভবন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানে গণতন্ত্রকে বিপন্ন করে এবং পূর্বাংশের সংখ্যাগরিষ্ট জনগণের স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে স্বাধীনা বাংলাদেশের জন্ম হয়।

স্বাধীনতার পর পর সরকার টাকার কৃত্রিম উচ্চ মূল্য বজায় রাখার নীতি অব্যাহত রাখেন। তীব্র বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের কারণে আমদানি সংকুচিত রাখার নীতিও বাধ্যতামূলকভাবে চালু থাকে। এমতাবস্থায় শিল্পায়নের ক্ষেত্রে যে নতুন সমস্যাগুলোর সৃষ্টি হয় তা নিম্নরূপ-

ক. আগের মত রপ্তানিমুখী শিল্প অপেক্ষাকৃত প্রতিকূল দামের কারণে নিরুৎসাহিত হতে থাকে। ড. মাহাবুব হোসেন ও এ.আর.খান দেখিয়েছেন যে ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারী বিনিময় হার ছিল ১ ডলার = ৭.৯৭ টাকা। পক্ষান্তরে আমদানিকারক ১ ডলারের বিদেশী পন্য বাজারে বিক্রি করে পেতেন ৯.৭২ টাকা। আবার ১৯৭৩-৭৪ এ ১ ডলারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যের জন্য এবং ৯.৯৭ (অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। এই অবস্থা ১৯৭৬-৭৭-এ আরও নিম্নগামী হয়। তখন বৈদেশিক মুদ্রার সরকারী বিনিময় হার দাঁড়ায় ১ ডলার = ১৮.২৩ টাকা।

খ. উপরোক্ত নীতিমালার কারণে উদ্যোক্তারা স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম দিকে উৎপাদনশীল শিল্পে (বিশেষত: রপ্তানিমুখী শিল্প) বিনিয়োগ না করে, আমদানি ব্যবসার মাধ্যমে দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য সচেষ্ট হন। বিশেষত: ব্যাপক জাতীয়করণের ফলে ব্যক্তিখাতে শিল্প বিনিয়োগের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে।

গ. এসময় আমদানিকারকরা ব্যাপকভাবে "ওভার-ইনভয়েসিং" এর আশ্রয় নিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে পাচার করেছেন। আবার কখনো বা আন্ডার-ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে সরকারের প্রাপ্য কর ও শুল্ক থেকে সরকারকে বঞ্চিত করেছেন।

ঘ. যদিও সরকারী নীতির একটি লক্ষ্য ছিল দেশী শিল্পের সংরক্ষণ (Protection) কিন্তু বাস্তবে চোরাপথে ভারত থেকে পন্য আমদানির কারণে এই লক্ষ্য অনেক ক্ষেত্রে অর্জিত হয়নি।

ঙ. তীব্র আমদানি ও উৎপাদন ঘাটতির কারণে সাধারণভাবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে স্বাধীনতার পর পর সবকিছুর মূল্য বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত মূল্যের ফলে যে বর্ধিত মুনাফা হওয়ার কথা ছিল তা রাষ্ট্রায়ত্ব কারখানা/দোকানগুলোর ভাগ্যে জুটেনি কারণ তখন সরকার বাজারে সরকারী মূল্য নির্ধারন করে দিয়েছিলেন। উৎপাদ খরচের সঙ্গে স্বাভাবিক 'মার্ক-আপ' যোগ করে তা নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে এই "ন্যায্যমূল্য" ক্রেতার ভোগ করেনি, বেশি দামেই তা বাজারে বিক্রি হয়েছিল এবং ঘাটতি প্রিমিয়াম বা খাজনা হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্য মধ্যস্বত্ত্বভোগী ব্যবসায়ীদের পকেটে জমা হয়েছিল।

চ. এসব কারণে ব্যক্তিগত ব্যবসার মাধ্যমে প্রচুর অর্থের অধিকারী এরকম অনেক পরিবারের সৃষ্টি হয়। এরা তাদের অর্থ বিনিয়োগের জন্য উৎপাদনশীল শিল্প খাতের পরিবর্তে, ভোগ -বিলাস, দালান-কোঠা নির্মাণ, ছেলে-মেয়েদের বিদেশে রেখে শিক্ষা দান, সরবরাহ ব্যবসা, আমদানি, রপ্তানি, জমি ক্রয়, রাজনীতি ইত্যাদিকে বেছে নিতে তৎপর হন।

৮০-এর দশকে তদানীন্তন সরকারের পতনের পর, বৈদেশিক দাতা দেশগুলোর পরামর্শ ও চাপের মুখে বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা নীতি, শিক্ষানীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি। সর্বক্ষেত্রে মৌলিক রূপান্তর সাধিত হয়। সরকারী কোষাগারে ইতোমধ্যে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা জমা হওয়ায় (বিশেষত: বিদেশে অবস্থানরত শ্রমিকদের পাঠানো "রেমিট্যান্সের কারণে) ডলারের বিনিময় হার সরকারী পর্যায়ে এবং বাজারে পরস্পর কাছাকাছি চলে আসে। ১৯৭৯-৮০ সালে ওয়েজ আর্ণার স্কীমের অধীনে খোলা বাজারে শ্রমিকরা ১ ডলারের বিনিময়ে সরকারী হারের তুলনায় ২৪ শতাংশ বেশি টাকা লাভ করতেন। ১৯৮৬-৮৭ সালে এই বাড়তি প্রিমিয়াম মাত্রা কমে দাঁড়ায় মাত্র ৮.৪ শতাংশ। ১৯৮০-র দশকে মূলত: দাতা গোষ্ঠীর তাগিদে বাংলাদেশ ক্রমশ: আমদানি উদারীকরণ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখন এবং এখনো এই পরিবর্তিত নীতিমালার পক্ষে

নিম্নোক্ত যুক্তিগুলো প্রদান করা হচ্ছে-

ক. আমদানি উদার না করলে দেশের ভেতরে যে ধরনের সংরক্ষিত শিল্প গড়ে উঠে তারা আসলে অদক্ষ থেকে যায় এবং পরবর্তীতে ভর্তুকি ছাড়া তাদেরকে টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পাড়ে।

খ. অন্যদিকে আমদানি উদার হলে আমদানিকৃত কাঁচামাল ও ভোগ্য পণ্যের দাম হ্রাস পাবে এবং এতে ভোক্তা ও ঐ কাঁচামাল ব্যবহারকারী শিল্পগুলো লাভবান হবে।

গ. বর্তমানে মুক্ত বাণিজ্য ও বিশ্বায়নের যুগে অর্থনীতি বিদেশী বাজারের সঙ্গে যুক্ত ও সমন্বিত হতে বাধ্য। সুতরাং কৃত্রিম শুল্ক আরোপের মাধ্যমে দেশীয় বাজারে কৃত্রিম দাম বজায় রাখার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না।

দাতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে যুক্তিসমূহ

পূর্ববর্ণিত অনুচ্ছেদে আমদানি উদারীকরণ এবং রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের পক্ষে যেসব যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে তা মূলত: দাতা দেশগুলো সম্মিলিত সংস্থা বিশ্বব্যাংক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের (I.M.F) পরামর্শকমন্ডলীর প্রেসক্রিপশন থেকে নেয়া হয়েছে। আমাদের স্থানীয় অনেক অর্থনীতিবিদগণ এসব যুক্তির বিরুদ্ধে পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন। সেগুলো সংক্ষেপে নিম্নরূপ-

ক. বাংলাদেশে শিল্পায়নের শ্লথ গতির প্রধান কারণ আমদানি-রপ্তানি নীতির মধ্যে খোঁজ ঠিক নয়। রপ্তানিযোগ্য পণ্যের দাম কমিয়ে দিলেই রপ্তানির বাজার প্রসারিত হবে এবং রপ্তানি শিল্প বিকশিত হবে এমন নাও হতে পারে। আর আমদানি শুল্ক তুলে প্রচুর কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানি হবে ও নতুন শিল্প গড়ে উঠবে এ কথাও সত্য নয়। রপ্তানিমুখী শিল্পে বিনিয়োগকারীরা জানেন যে আমদানি-রপ্তানি ব্যবসা, দালান-কোঠা নির্মাণ ও রাজনীতিতে বিনিয়োগ অপেক্ষাকৃত অধিকতর লাভজনক তারা আরো জানেন শিল্প উৎপাদনে আত্মনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সেবা (বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস, বন্দর সুবিধা) ইত্যাদি যোগাড় করা বাংলাদেশে সহজসাধ্য নয়, বিদেশের বাজারও এখনো বাংলাদেশের জন্য সর্বত্র উন্মুক্ত নয়-নানা অশুল্ক-শুল্ক জাতীয় প্রতিবন্ধকতা এখনো বিদ্যমান। এছাড়া বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত প্রযুক্তি, জ্ঞান, পুঁজি ও দক্ষতা বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তাদের এখনো গড়ে উঠেনি। আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প গড়ে উঠেনি। আমদানিকৃত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্পের প্রতিষ্ঠা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে প্রথমবাস্থায় মোটেও বিনা ভূর্তকীতে সম্ভব নয়।

খ. সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে ১৯৮০-র পর থেকে বাণিজ্য উদারীকরণ ও রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের জন্য প্রচুর অনুকূল নীতিমালা গৃহীত হয়েছিল কিন্তু এখন পর্যন্ত তার যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা স্থানীয় অর্থনীতিবিদদের মতে যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক নয়। বস্তুত: ৯০-র দশকে দক্ষিণ এশিয়ার অ্যন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত দ্রুততর হারে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছিল। এমনকি দাতারা যেসব দেশকে রপ্তানিমুখী শিল্পায়নের মডেল বা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরেন যেমন দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান ইত্যাদি দেশও প্রথমাবস্থায়ও এত ব্যাপক ভিত্তিতে শুল্ক হ্রাস করেনি। এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে বাংলাদেশে অনেক শিল্পই বর্তমানে বিদেশী প্রতিযোগিতার মুখে পরাস্ত হয়ে রুগ্ন হয়ে পড়েছে। অন্তত: ২০০টি সে ধরনের শিল্পের তালিকা শিল্প মন্ত্রণালয় তৈরি করেছেন। বিশেষত: যন্ত্রপাতি ও মূলধনী দ্রব্যের শিল্প আমদানি উদারীকরণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এই কালপর্বে একমাত্র আশাব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে পোশাক শিল্পে। কিন্তু এই উন্নতির পেছনে মূলত: কাজ করেছে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে প্রাপ্ত "সংরক্ষিত কোটা সুবিধা"।

বিদেশের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মত প্রযুক্তি, জ্ঞান, পুঁজি ও দক্ষতা বাংলাদেশের নতুন উদ্যোক্তাদের এখনো গড়ে উঠেনি।

গ. সামগ্রিকভাবে বলা যায় বাংলাদেশের শিল্পায়ন "এক্সপেরিমেন্ট" দুই বিপরীতধর্মী অর্থনৈতিক নীতিমালার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পর অতিরিক্ত রপ্তানি বিরোধী নীতি এবং নব্বই দশকে অতিরিক্ত আমদানি উদারীকরণ নীতির দ্বারা শিল্পায়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়ন না হওয়ার জন্য এসব নীতিগত ত্রুটির চেয়েও অন্যান্য অর্থনৈতিক রাজনৈতিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতাই অধিকতর দায়ী।

গার্মেন্টস শিল্প ঃ সফলতার একটি দৃষ্টান্ত

১৯৭৮ সালে বাংলাদেশের একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান "রিয়াজ গার্মেন্টস" সর্বপ্রথম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু তৈরি পোশাক রপ্তানি করে দেশের জন্য ১ মিলিয়ন ডলার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করে। কিন্তু পরবর্তী দুই দশকে এই তৈরি পোশাক শিল্পের খাতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি অর্জিত হয়। পরবর্তী দুই দশকে গড়ে প্রতি বছর এই খাতে প্রবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১৫ ভাগ। এমনকি ১৯৮৩ সালেও এই খাতে ফ্যাক্টরীর সংখ্যা ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। কিন্তু ১৯৯৯ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০০০টি। এসব কারখানায় কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫ লক্ষ। গার্মেন্টস শিল্প পুরোটাই গড়ে উঠেছে ব্যক্তি মালিকানার অধীনে। ১৯৯২ সালের এক হিসাবে জানা যায় যে ব্যক্তি খাতের ম্যানুফ্যাকটারিং ইউনিটগুলোর ৭ শতাংশ ইউনিট, মজুরি ও বেতন তহবিলের ৩০ শতাংশ এবং মোট মূল্য সংযোজনের ২৩.৫ শতাংশই সংগঠিত হয় বা আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। [ভট্টাচার্য্য, ১৯৯২]। ১৯৮৫ সালে এই শিল্পের রপ্তানি আয় ছিল বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের মাত্র ১২.৪৪ কিন্তু ১৯৯৯ সালে তা ৭৬.১৫ শতাংশ পরিণত হয়েছে।

এই শিল্পের মূল চালিকা শক্তি ছিল দু'টি। প্রথমত: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে বাংলাদেশের জন্য সংরক্ষিত কোটা সুবিধা দেয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়ত: বাংলাদেশে অর্ধ দক্ষ বা অদক্ষ নারী শ্রমিকদের মজুরি মাত্রা ছিল খুবই কম। কিন্তু ২০০৫ সাল নাগাদ যখন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি অনুযায়ী কোটা সুবিধা ক্রমশ: উঠে যাবে তখন এই শিল্প অবাধ প্রতিযোগিতার মুখে টিকে থাকতে পারবে কি ননা সে বিষয়ে অনেকের মনে যথেষ্ট সংশয় ছিল। ফলে কোটা সুবিধা বঞ্চিত অপেক্ষাকৃত অগ্রসর উন্নয়নশীল দেশগুলো বাংলাদেশে তাদের শিল্প, জ্ঞান ও প্রযুক্তি স্থানান্তরিত করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। এছাড়া এই শিল্পের কাঁচামাল উন্নয়নশীল দেশ থেকে আমদানি হয়ে আসে এবং চূড়ান্ত উৎপাদন উন্নত দেশে বিক্রি করে কাঁচামালের দাম পরিশোধের তাৎক্ষণিক সুবন্দোবস্ত বিদ্যমান গড়ে উঠেছে। ফলে দ্রুত পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে এবং বহু ক্ষুদ্র ও মাঝারি পুঁজির শিক্ষিত মালিকরা এই শিল্পে উদ্যোক্তা হিসেবে পুঁজি বিনিয়োগে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। সস্তা ও নির্বিরোধী নারী

শ্রমিকদের সুলভ উপস্থিতি এক্ষেত্রে আরও প্রণোদনা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এই শিল্পের প্রধান দূর্বলতা হচ্ছে কাঁচামালের জন্য আমদানির উপর নির্ভরতা। ফলে এই শিল্পে অর্জিত রপ্তানি মূল্যের একটি বৃহৎ অংশই (গড়ে অর্ধেকের বেশি) আমদানি বাবদ বিদেশে চলে যায়। বর্তমানে বাংলাদেশের সমগ্র শিল্পখাতের জন্য যে পরিমাণ কাঁচামাল আমদানি করতে হয় তার ৭৫ ভাগই করা হয় শুধুমাত্র তৈরি পোশাক শিল্পের কাঁচামাল বাবদ।

প্রথমত, এটি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে তৈরি পোশাক শিল্পের কারণে পুরো পৃথিবীতে বাংলাদেশের একটি ব্র্যান্ড ভ্যালু তৈরি হয়েছে। তবে এটাও সত্য যে প্রযুক্তিগত দিক থেকে বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বেশিরভাগ ভারী যন্ত্রপাতি এখনও বিদেশ থেকে নিয়ে আসতে হয়। সেগুলোকে কাজের জন্য সঠিক উপায়ে প্রস্তুত করতে গেলেও দেশীয় প্রকৌশলীদের অনেক ক্ষেত্রে হিমশিম খেতে হয়। অর্থাৎ তৈরি পোশাক শিল্প যতটা প্রযুক্তিবান্ধব হওয়ার কথা ছিল এই সুদীর্ঘ সময়ে ততটা বাস্তবে হয়নি। অবকাঠামোগত ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখনও অন্যান্য দেশের মুখাপেক্ষী, এটি দেশের তৈরি পোশাক শিল্পের অন্যতম বড় একটি সীমাবদ্ধতা।

দ্বিতীয়ত, দেশের সুবৃৎ এই শিল্পটি আক্ষরিক অর্থেই পরিবেশবান্ধব নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে বেশিরভাগ বিসিক শিল্প নগরীগুলো স্থাপিত হয়েছে কোনো নদীর তীর ঘেঁষে। কারখানাগুলোতে বিভিন্ন কাজের ফলে প্রতিনিয়ত নানা রকমের বর্জ্য তৈরি হচ্ছে যেগুলো সরাসরি নদীর পানিতে গিয়ে মিশছে। নিয়মানুযায়ী প্রতিটি কারখানায় Effluent treatment plant থাকার কথা, যদিও দেশের খুব কম সংখ্যক কারখানাতেই এই ধরনের প্ল্যান্ট রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে শিল্পখাতে স্বাধীনতার পর পর রপ্তানি বিরোধী নীতিমালার বাতাবরণে ছিল। আমদানি ঘাটতি প্রিমিয়াম অর্জন করে এ সময় এক দল ধনীর সৃষ্টি হয়েছিল। এরা শিল্পোৎপাদনের চেয়ে আমদানি ব্যবসা, সাপ্লাই, দালান-কোঠা নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রায়ত্ব খাতে শিল্পেও নানা ধরনের দূর্নীতির কারণে কোন উদ্বৃত্ত তখন তৈরি হতে পারে নি। আশির দশকে এই নীতির পরিবর্তন হয়। উদার আমদানি ও ব্যক্তিখাতকে অবাধ সুবিধা প্রদান করা হয়। কিন্তু এবার অতিরিক্ত আমদানি উদারীকরণের ফলে স্থানীয় মূলধনী ও কাঁচামাল উৎপাদনকারী শিল্পগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তবে এই সময় রপ্তানি বিরোধিতা (Anti Export Bias) কমে আসে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে তৈরি পোশাকের খাতে কিছু বাড়তি কোটা সুবিধা প্রদান করা হয় যায় ফলে বাংলাদেশে বিশেষ সুবিধার বাতাবরণে দ্রুত তৈরি পোশাক শিল্পের বিস্তার ঘটে। বাংলাদেশের ব্যক্তিখাতে সফল শিল্প বিকাশের অন্যতম দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই তৈরি পোশাক শিল্প। কিন্তু এর অন্যতম দূর্বলতা হচ্ছে "পশ্চাদবর্তী সংযোগ শিল্পের" অভাব। এই শিল্পের বেশির ভাগ কাঁচামাল বর্তমানে অন্যান্য অপেক্ষাকৃত উন্নত কিন্তু কোটা সুবিধা বঞ্চিত উন্নয়নশীল দেশগুলো (যেমন ভারত, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড ইত্যাদি) থেকে এসে থাকে। তাই ২০০৫ সাল নাগাদ যখন আন্তর্জাতিক চুক্তি অনুযায়ী "বহুপাক্ষিক ফাইবার চুক্তি" (M.F.A) বাতিল হয়ে যাবে তখন কোটা সুবিধা বঞ্চিত হয়ে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে। এর মধ্যে তৈরি পোশাক শিল্পের পশ্চাদমুখী সংযোগ শিল্পসমূহ গড়ে তুলতে না পারলে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পকে বিস্তর সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. স্বাধীনতার পর সাধারণভাবে বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে যায় কারণ-
ক. আমদানি ঘাটতি; খ. আমদানি ঘাটতি ও যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অর্থনীতিতে উৎপাদন ঘাটতি;
গ. যুদ্ধ বিধ্বস্ত অর্থনীতি।

২. স্বাধীনতার পর দ্রুত এক দল নব্য ধনীর সৃষ্টি হয়-
ক. আমদানি ব্যবসা ও রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানাকে শোষণ করে;
খ. রাষ্ট্রায়ত্ত্ব কারখানায় লুটপাটের মাধ্যমে।

৩. বাংলাদেশের নব্য ধনীকরা শিল্পোৎপাদনে আগ্রহী ছিলেন না করণ-
ক. শিল্পোৎপাদনের জন্য অবকাঠামো অনুকূল ছিল না
খ. রপ্তানিমুখী বা আমদানি প্রতিস্থাপক শিল্প স্থাপনের চেয়ে অন্যান্য খাতে পুঁজি বিনিয়োগ বেশি লাভজনক ছিল;
গ. তারা ভোগ, বিদেশে অর্থ পাচার, দালান-কোঠা নির্মাণে অধিক আগ্রহী ছিলেন
ঘ. উপরের সবগুলো।

৪. ১৯৭৩-৭৪ সালে সরকারি বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার ছিল বাজারের বিনিময় হারের তুলনায়-
ক. সমান; খ. বেশি গ. কম।

৫. ১৯৭৩-৭৪ সাল থেকে ১৯৮০ সাল নাগাদ সরকারী বিনিময় হার ও বাজারের বিনিময় হারের ব্যবধান ক্রমশ:
ক. কমে এসেছে:
খ. বেড়েছে:
গ. কখনো কমেছে, কখনো বেড়েছে।

৬. ১৯৮০ দশকে বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের নীতিমালা ছিল-
ক. আমদানির প্রতিকূলে, রপ্তানির অনুকূলে;
খ. আমাদানির অনুকূলে, রপ্তানির প্রতিকূলে;
গ. আমদানি ও রপ্তানি উভয়ের অনুকূলে।

৭. বাংলাদেশের শিল্পায়নের শ্লথ গতির পেছনে প্রধান কারণ হচ্ছে-
ক. দীর্ঘকাল ব্যাপী অনুসৃত ব্যক্তিখাত বিরোধী এবং রপ্তানি বিরোধী নীতি;
খ. উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত মাত্রায় বাজার সংরক্ষণ না করা;
গ. উপরোক্ত সবগুলো কারণ এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক কারণসমূহ।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য কি ধরনের বৈদেশিক বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশের অন্যতম সফল শিল্পায়ন দৃষ্টান্ত তৈরি পোশাক শিল্পের সবলতা ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করুন।

পাঠ-৪.৫ ঃ শিল্প খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগ

এই পাঠ শেষে আপনি জানতে পারবেন-

- বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ও প্রবণতা এবং কাঠামো;
- বিদেশী বিনিয়োগের প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো;
- জাতীয় স্বার্থে বিদেশী বিনিয়োগের নীতিমালা সম্পর্কে ধারণা;
- তেল-গ্যাস ও বিদ্যুৎ তথা শক্তি খাতে বিদেশী বিনিয়োগের যে চমকপ্রদ উত্থান।

বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহের পরিমাণগত প্রবণতা

বহুজাতিক কোম্পানি ও বিদেশী পুঁজিপতিরা বাংলাদেশে যে সমস্ত উদ্যোগ (Enterprise) অর্থ নিয়োগ করেন তাদেরকেই বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বলা হয়। তা যৌথ উদ্যোগে, একক উদ্যোগ বা অন্য নানা ধরনের হতে পারে। ১৯৮০ দশকের পর থেকে প্রায় সব উন্নয়নশীল দেশই বিদেশী পুঁজিকে অর্থনীতিতে আকৃষ্ট করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। কারণ বিদেশী পুঁজি একটি উন্নয়নশীল দেশে-

ক. বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় ঘটায়
খ. নতুন প্রযুক্তি হস্তান্তরিত করে
গ. নতুন কর্মসুযোগ সৃষ্টি করে
ঘ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে।

এশিয়া প্রশান্ত সাগরীয় এলাকায় অবস্থিত অন্যান্য দেশগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশেও বর্তমানে এই অঞ্চলে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির অংশীদার। তবে নানা কারণে বাংলাদেশ এশিয়াতে নিয়োজিত বিদেশী পুঁজির খুব সামান্য অংশই নিজ দেশে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। ১৯৮৬-৯১ কালপর্বে বাংলাদেশে এসেছে মাত্র ১১ মিলিয়ন ডলার বিদেশী বিনিয়োগ, যা কিনা এশিয়ায় নিয়োজিত মোট বিদেশী বিনিয়োগের মাত্র ১.৮ মি. ডলার। পক্ষান্তরে শুধুমাত্র গণচীনে এই প্রবাহের পরিমাণ ছিল গড়ে প্রতি বছর ৩১০৫ মি: ডলার। একই কালপর্বে তুলনীয় পরিমাণ ভারতে ছিল ২২৩ মি: ডলার পাকিস্তানে ১৮৯ মি; ডলার এবং শ্রীলংকায় ৫০ মি: ডলার। [সাদরেল রেজা ও আলী রশীদ, ১৯৯৭, দ্র:]

বাংলাদেশে ১৯৯৩ এর জুন নাগাদ মোট অনুমোদিত (Sanctional) বিদেশী পুঁজির পরিমাণ হচ্ছে ৯৬১৮.৩ মি: টাকা [সারণী ৪.৫ দ্র:] ১৯৭১ পর্যন্ত আগেই অনুমোদিত হয়েছিল ২৮৩.২ মি. টাকা আদ বাকিটা অনুমোদিত হয়েছে স্বাধীনতার পর। বাস্তবে অবশ্য সর্বদাই অনুমোদিত পরিমাণের তুলনায় প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমাণ কমই ছিল। বস্তুত: ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজির অনুমোদন দান শুরুই হয় ১৯৭৫-এর পর। ১৯৭৭ সালে বাৎসরিক অনুমোদিত বিদেশী পুঁজি অনুমোদন দান শুরুই হয় ১৯৭৫-এর পর। ১৯৭৭ সালে বাৎসরিক অনুমোদিত বিদেশী পুঁজি ১০.৪৭ মি: টাকা থেকে সাধারণভাবে বছর বৃদ্ধি পেয়ে (কিছু ওঠা-নামা সত্ত্বেও) ১৯৯০ সালে সর্বোচ্চ ১৯৪৫ মি: ডলারে উপনীত হয়। কিন্তু তারপর ১৯৯৩ পর্যন্ত তা আবার হ্রাস পেতে থাকে।

উপরোক্ত "প্রবণতাটি" অনুমোদিত বিদেশী পুঁজির প্রবণতা।

সারণী ৪.৫ ঃ বাংলাদেশে অনুমোদিত প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহ (মি: টাকায় বিরাজমান বাজার দরে)

বৎসর	অনুমোদিত ইউনিটে বৈদেশিক পুঁজির পরিমাণ
১৯৭১ পর্যন্ত	২৮৩.২০
১৯৭২-১৯৭৬	০
১৯৭৭	১০.৪৭ (০.৬৮)
১৯৭৮	০
১৯৭৯	৭৪.৬৯ (৪.৯১)
১৯৮০	৫৩.৯৭ (৩.৪৮)
১৯৮১	৪.৫৬ (০.২৮)
১৯৮২	৪০৩.৯০ (২০.১৩)
১৯৮৩	৬০৯.৬৮ (২৫.৬২)
১৯৮৪	৭৫.১০ (৩.০৭)
১৯৮৫	১৬১.৩২ (৬.২১)
১৯৮৬	৯৬.৮০ (৩.২৪)
১৯৮৭	১৫৯১.৪৫ (৫১.৯৬)
১৯৮৮	১৫৭১.৪১ (৫০.৩০)
১৯৮৯	৭৭২.৩৬ (২৪.০৩)
১৯৯০	১৯৪৫.০০ (৬০.২৭)
১৯৯১	৩৩১.৮০ (৯:৩০)
১৯৯২	১২৪৫.৩১ (৩২.৬৪)
১৯৯৩ (জুন পর্যন্ত)	৩৮৭.২৮ (৯.৭৫)

উৎস: বিনিয়োগ বোর্ড, বাংলাদেশ সরকার

নোট: ব্র্যাকেটভুক্ত সংখ্যাগুলো হচ্ছে মি. ডলারের অংকে।

আমাদের মনে রাখা উচিত যে সাধারণভাবে অনুমোদিত বিদেশী পুঁজির তুলনায় প্রকৃত বিদেশী পুঁজি প্রবাহ ছিল অনেক কম। বস্তুত: ১৯৭২-৯৩ কাল পর্বে অনুমোদনকৃত বিদেশী পুঁজি ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল ১৭০টি। পক্ষান্তরে এই ১৭০টির মধ্যে অর্ধেকেরও কম সংখ্যক ইউনিট (৮২টি) এই সময় উৎপাদন চালু অবস্থায় যেতে পেরেছিল ২৪টি, সেখানে সে বছর চালু হয়েছিল মাত্র ৫টি ইউনিট।

৪.৫ নং সারণীতে প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগ প্রবাহের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঐ তালিকায় দেখা যাচ্ছে যে ১৯৭৯-৯০ কালপর্বে মোট অনুমোদিত ৭,৩৬০ মি. টাকার বিদেশী বিনিয়োগের মধ্যে বাস্তবে প্রকৃত বিনিয়োগ হয়েছে ২,২৯৩ মি. টাকা। অর্থাৎ গড়ে মাত্র এক-তৃতীয়াংশের কাছাকাছি। উপরোক্ত সারণীতে এটাও স্পষ্ট যে, মোট প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশই অতীত বিনিয়োগলব্দ আয় থেকে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে এসেছে। বাকি ২৫ শতাংশই বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশই অতীত উপরোক্ত সারণীতে এটাও স্পষ্ট যে, মোট প্রকৃত বিদেশী বিনিয়োগের ৭৫ শতাংশই অতীত বিনিয়োগলব্দ আয় থেকে পুনর্বিনিয়োগের মাধ্যমে এসেছে। বাকি ২৫ শতাংশের মধ্যে ২২ শতাংশ নগদ অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে এবং ৩ শতাংশ নতুন যন্ত্রপাতি আমদানির মাধ্যমে করা হয়েছে।

বছর	নগদ পুঁজি বিনিয়োগ	যন্ত্রপাতি ক্রয়	আয় থেকে পুনর্বিনিয়োগ	মোট বিনিয়োগ
১৯৭৯	৩০.৩৯	১১.০৯	৩২.৯৩	৭৪.৪১

১৯৮০	১৪.০৯	০.০১	৫৪.০৭	৬৮.১৭
১৯৮১	২৭.১৭	৫.০৩	৭১.০৫	১০৩.২৫
১৯৮২	১৪.৯১	০.৮৮	৮৬.৫৬	১০২.৩৫
১৯৮৩	২১.২৯	২৫.৬৭	২৫.২১	৭২.১৭
১৯৮৪	-১০.৮৩	২৩.১৬	৬৮.৪৬	৮০.৭৯
১৯৮৫	৮৮.২৮	৩.৭০	১৫৭.২৮	২৪৯.২৬
১৯৮৬	১০৮.১৭	০.০১	৭৯.২৭	১৮৭.৪৫
১৯৮৭	১০৭.৪৭	০.৭৩	২২৩.৭৮	৩৩১.৯৮
১৯৮৮	২৬.৭৯	০.১৩	২৫৫.৭১	২৮২.৬২
১৯৮৯	৪১.২৬	৭.৭৮	৩৩১.৯৪	৩৮০.৯৮
১৯৯০	২৮.৩১	৪.৯৬	৩২৬.৩৯	৩৫৯.৬৬
সর্বমোট	৪৯৭.২৯(২১.৭)	৮৩.১৫(৩.৬)	১৭১২.৬৫(৭৪.৭)	২২৯৩.০৯(১০০)

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক (১৯৯১)

যদিও ৯০ দশকে সরকারী মহল (উভয় সরকারের আমলেই) থেকে বিদেশী বিনিয়োগের বর্ধিত প্রবাহ নিয়ে বহু প্রশংসা ও আত্মতৃপ্তির দাবী করা হয়েছিল। বাস্তবে কিন্তু প্রকৃত বিনিয়োগ আশানুরূপ হয়নি। অনুমোদনকেই বাস্তব বিনিয়োগ ধরে নেয়ার কারণেই এধরনের মিথ্যা আশাবাদ সৃষ্টি করা সম্বব হয়েছে।

১৯৯৬-২০০০ কালপর্বে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত স্বরূপটি নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী ৪.৭ ঃ কালপর্বে বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রকৃত স্বরূপটি নীচের সারণীতে তুলে ধরা হল।

সারণী ৪.৭ ঃ ৯০ দশকে নীচ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের গতি প্রবাহ

বছর	বিদেশী বিনিয়োগ						ই.পি.জেড বিনিয়োগ	মোট নীট বিনিয়োগ
	অন্তঃপ্রবাহ	বহিঃপ্রবাহ	নীট	অন্তঃপ্রবাহ	বহিঃপ্রবাহ	নীট		
১৯৯৬-৯৭	১৭	১	১৬	১৬	১৪৮	-১৩২	৫৩.৮৮	-৬২.১২
১৯৯৭-৯৮	২৭৩	২৪	২৪৯	১৪	১১	৩	৬৮.৮২	৩২০.৮২
১৯৯৮-৯৯	২০০	২	১৯৮	৩	৯	-৬	৭০.৬১	২৬২.৬১
১৯৯৯-০০	১৯৪.৪	০.৮	১৯৩.৬	১০.৭	১০.৬	০.১	৩৪.৯৮	২২৮.৬৮

উৎস: আই.আর.বি.ডি, ২০০০, পৃ: ২৮

বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রবাহের গুণগত প্রকৃতি

বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগ এসেছে প্রধানত: অংশীদারিত্ব ভিত্তিক যৌথ কারবার হিসেবে। স্বাধীনতার পর যে ১৭৭ টি প্রতিষ্ঠানে বিদেশী বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে (১৯৯৩ পর্যন্ত) তাঁর মধ্যে মাত্র ১১টির সম্পূর্ণ মালিকানা বিদেশীদের হাতে। বাকী প্রতিষ্ঠানগুলোতে বিদেশী ইকুইটি পুঁজির পরিমাণ ৯ থেকে ৯০ শতাংশের মধ্যে ওঠা নামা করেছে। তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক প্রতিষ্ঠানে এর আপেক্ষিক পরিমাণ হচ্ছে ৪৯ শতাংশ। অবশ্য ইকুইটি ছাড়া যে আরেক ধরনের বৈদেশিক বিনিয়োগ বাংলাদেশে এসেছে তা হচ্ছে লাইসেন্স ট্রেডমার্কিং এবং যান্ত্রিক কর্মকুশলতা প্রদান ও বিনিময়ে রয়ালিটি গ্রহণ। এ ধরণের প্রধান বিনিয়োগ হয়েছে গাড়ি, ডিজেল ইঞ্জিন, ঔষধ শিল্প ইত্যাদি খাতে।

বাংলাদেশে স্বাধীনতার আগে প্রধানত: বিদেশী বিনিয়োগ হয়েছে ঔষধ শিল্প এবং পেট্রোলিয়াম শিল্প খাতে। বস্তুত: পাকিস্তান আমলে আমদানী বিকল্প হিসেবে এসব শিল্প যখন গড়ে তোলা হয় তখন তৈরি বাজারের প্রত্যাশায় বিদেশীরা এসব খাতে বিনিয়োগ করেছিলেন। এছাড়া কিছু পরিমাণ

বিদেশী বিনিয়োগ হতে রপ্তানীমুখী চা বাগান ও পাট শিল্পে। বলা যায় স্বাধীনতা পূর্বকালে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রায় পুরোটাই শিল্প খাতে নিয়োজিত হত।

স্বাধীনতা বিদেশী বিনিয়োগের বন্টনে লক্ষ্যনীয় চরিত্রগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ১৯৭৯ সালে বিদেশী বিনিয়োগের প্রায় ৪২ শতাংশ যেত ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পে। কিন্তু ১৯৯০ সাল নাগাদ এই অংশটি দাঁড়ায় মাত্র ১.৬২ শতাংশ। পক্ষান্তরে 'ব্যবসা' খাতে বিদেশী বিনিয়োগ ১৯৭৯ সালে ছিল ৪১ শতাংশ। ১৯৯০ সালে এটি বেড়ে দাঁড়ায় ৯২ শতাংশ। ১৯৭৯-৯০ সমগ্র কালপর্বে মোট বিদেশী বিনিয়োগের .৯৯ শতাংশ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বাকিটা পরিবহন, নির্মাণ ও অন্যান্য নানাবিধ উপখাতে। [সারণী ৪.৮]

১৯৭২-৭৩ থেকে ১৯৯২-৯৩ পর্যন্ত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে মোট যে বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে তার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সবচেয়ে বেশি বিদেশী পুঁজি নিয়োজিত হয়েছে বস্ত্র ছিল্পে (গার্মেন্টসসহ)। এর পরিমাণ হচ্ছে ৩১১৭.৯ মি. টাকা। অর্থাৎ শিল্পখাতে এই কালপর্বে বিনিয়োজিত মোট ১৫৪১৩.৭৬ মি. টাকার প্রায় ২০ শতাংশ। এর পরেই রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের স্থান: মোট বিনিয়োগের ১৬ শতাংশ। তৃতীয় স্থানে রয়েছে "রাসায়নিক শিল্পসমূহ" মোট বিনিয়োগের মাত্র ৮ শতাংশ।

সারণী ঃ ৪.৮ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের বিন্যাসঃ অর্থনৈতিক খাত অনুসারে (শতাংশ হিসাবে)

খাতসমূহ	১৯৭৯	১৯৮১	১৯৮৩	১৯৮৫	১৯৮৭	১৯৯০	১৯৭৯-৯০
কৃষি	-০.০৩	০.৬৭	১.৩৪	১.৪৮	০.২২	১.৩৮	০.৯৯
শিল্প	৪১.৬৫	২৭.০২	৮১.৬১	৪৫.২১	৩৮.১৪	১.৬২	২৩.৭৬
নির্মাণ	-১.২১	০	০	০	০	০	০-০৪
ব্যবসা-বানিজ্য	৪১.০৫	৬৬.০৯	১৫.০৭	৫১.৭২	৫৪.৫৫	৯১.৬০	৬৯.১১
পরিবহন	০.০১	০.৪৪	(-)	-১.৮৭	১.৩০	০.৮৬	০.৩৭
অন্যান্য সেবা	১৮.৫৩	৫.৭৮	২.১০	৩.৪৬	৫.৭৯	৪.৫৪	৫.৮১
সকল খাত	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস্য: সাদরেল রেজা ও আলী রশীদ, ১৯৯৫

বৈদেশিক পুঁজির নিম্ন প্রবাহের সম্ভাব্য কারণ

অধ্যাপক সাদরেল রেজা ও আলী রশীদ পরিচালিত ১৯৭২-১৯৯৩ কালপর্বেল বৈদেশিক পুঁজিপ্রবাহ সংক্রান্ত গবেষণাপত্রটিতে "বৈদেশিক পুঁজি প্রবাহের" নিম্নহার এর কারণ বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা এবং বাংলাদেশের ভেতরেই সময় বিশেষ বিদেশী পুঁজি প্রবাহের ওঠানামা বিশ্লেষণ করে তারা নিম্নোক্ত সাধারণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন-

প্রথমত: বাংলাদেশের বর্তমান বৈদেশিক পুঁজি বিনিয়োগ নীতি যথেষ্ট উদার এবং প্রচুর সস্তা শ্রমও বাংলাদেশে পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে বিদেশী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রণোদনার কোন ঘাটতি নেই। তবে তারপরও প্রধানত: ৩টি প্রতিবন্ধকতার জন্য বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকারীর সহজে এগিয়ে আসতে চাইছিলো না। সেগুলো হচ্ছে-

ক. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভা।

খ. বিরাট বাজারের অনুপস্থিতি।

গ. দক্ষ শ্রমশক্তি ও উপযুক্ত অর্থনৈতিক অবকাঠামোর অভাব।

ঘ. বাংলাদেশের পুঁজি বিনিয়োগের সম্ভাব্য ক্ষেত্র, প্রণোদনা, সুযোগ-সুবিবধা ইত্যাদি বিষয়গুলো বাইরে ব্যাপকভাবে এখনো প্রচারিত হয় নাই। ফলে 'তথ্য' ঘাটতির জন্যও বিদেশী বিনিয়োগ উৎসাহিত হচ্ছে না।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণতভাবে খুবই কম। স্বাধীনতার পর ১৯৭৭

পর্যন্ত বস্তুত: কোন বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিতই হয়নি। ১৯৭৭ থেকে ১৯৭৩ পর্যন্ত যে পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ বাংলাদেশে হয়েছে তা প্রধানত: হয়েছে "অংশীদারিত্বের কারবারে" (Joint Business)। বেশির ভাগ বিদেশী বিনিয়োগই হয়েছে বানিজ্য খাতে। শিল্পখাতের মধ্যে যেটুকু বিদেশী বিনেয়োগ হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি হয়েছে বস্তু (গার্মেন্টস সহ) খাতে। এরপরই রয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প এবং রাসায়নিক শিল্পের স্থান। বাংলাদেশে যে পরিমাণ বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হয় তার মাত্র গড়ে এক তৃতীয়াংশ প্রকৃত বিনিয়োগ কম হওয়ার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক "প্রণোদনের অভাব" নয় প্রধান কারণ হচ্ছে অনুকুল রাজনৈতিক অবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়ক সেবায় ঘাটতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করুন।

১. বাংলাদেশে ব্যক্তিগত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ স্বাধীনতার পর ১৯৭৭ সালের আগে পর্যন্ত ছিল-

ক. শূন্য; খ. ২৮৩ মি. টাকা; গ. ১০০ মি. টাকা।

২. বাংলাদেশে অনুমোদিত বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ সাধারণভাবে প্রকৃত বিনিয়োগের তুলনায়-

ক. বেশি; খ. কম: গ. সমান।

৩. বাংলাদেশে ১৯৭১-৯৩ কালপর্বে সর্বোচ্চ বাৎসরিক বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ অনুমোদিত হয়েছে-

ক. ১৯৯০ সালে খ.১৯৮০ সালে গ. ১৯৭৭ সালে

৪. বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি প্রধানত: বিনিয়োজিত হয়-

ক. শিল্পে; খ. বানিজ্যে; গ. নির্মাণ খাতে।

৫. বাংলাদেশে শিল্পখাতে বিনিয়োজিত বিদেশী পুঁজির সর্ববৃহৎ অংশটি নিয়োজিত হয়েছে-

ক. বস্ত্র শিল্প খাত; খ. রাসায়নিক শিল্প খাতে গ. ধাতু শিল্পে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন:

১। টীকা লিখুন:

ক. অনুমোদিত বিদেশী পুঁজি;

খ. প্রকৃত পুঁজি বিনিয়োগ

গ. নীট পুঁজি প্রবাহ।

রচনামূলক প্রশ্ন:

১. বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি প্রবাহের নিম্নহারের কারণগুলো বিশ্লেষণ করুন।

২. বিদেশী পুঁজি প্রবাহের স্বাধীনতা উত্তর গতি প্রবণতা ব্যাখ্যা করুন।